স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৮ম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ এপ্রিল-মে ২০১৯

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টেটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

একটি অমৃতের অপমৃত্যু: অ্যান্টিবায়োটিক

আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন মানুষকে ছোঁয়াচে রোগকে জয় করতে সাহায্য করেছিল। তারপরে ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে জীবাণুরা অ্যান্টিবায়োটিকে মরছে না। এখন উপায়? লিখছেন—
ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা। **পৃ. ৪**

বাচ্চা মানুষ করার টিপস দিচ্ছেন **ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা,** আর শিশুকে আদর করে তেলমালিশ করার উপকার নিয়ে লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**। **পৃ. ৯ ও পৃ. ১১**

ক্যান্সার নিয়ে সহজপাঠ ডা. সমুদ্র সেনগুপ্তের কলমে, আর মেয়েদের স্তন-ক্যান্সার নিয়ে সাম্প্রতিক তথ্য দিচ্ছেন **ডা. অনুপম ব্রহ্ম**। **পৃ. ১৩ ও পৃ. ১৪**

অ্যালার্জি নিয়ে আমাদের ভুল ধারণার শেষ নেই, তাই চিকিৎসা ভুলপথে চালিত হয়ে যাবার সম্ভাবনাও বেশি। অ্যালার্জির বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নিয়ে লিখছেন ডা. **জয়ন্ত দাস**। **পৃ. ১৭**

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ওষুধ ওআরএস। মুখে খাবার নুন-চিনির এই শরবৎ অজস্র ডায়েরিয়া রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছে, আর চিকিৎসাকে মানুষের হাতের নাগালে এনেছে। ওআরএস আর তার আবিষ্কর্তা ডা. দিলীপ মহলানবিশকে নিয়ে লিখেছেন **ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক**। সঙ্গে রয়েছে **ডা. মহলানবিশের** সাক্ষাৎকারভিত্তিক জীবনকথা। **পৃ. ৪৮ ও পৃ. ৫২**

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

একটি অমৃতের অপমৃত্যু: অ্যান্টিবায়োটিক ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা ৪

বাচ্চা মানুষ করার কয়েকটি টিপ্‌স ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা ৯

নবজাতকের যত্ন-আত্তি: তেলমালিশ ডা. স্বপন বিশ্বাস ১১

ক্যান্সার নিয়ে সহজপাঠ ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত ১৩

স্তন ক্যান্সার: জ্ঞানবিকাশের এক যাত্রাপথ ডা. অনুপম ব্রহ্ম ১৪

অ্যালার্জি: কারণ ও চিকিৎসা ডা. জয়ন্ত দাস ১৭

নিউমোনিয়া ডা. পুণ্যব্রত গুণ ২১

খারাপ জিনের খপ্পরে ডা. প্রলয় বসু ২৩

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন ২৭

১২ মে ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত ২৮

ডাক্তার দিদির গল্প ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক ৩০

ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৩২

অটিজ়্ম: বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসা রুমঝুম ভট্টাচার্য্য ৩৭

রক্তের গ্রুপ ও রক্তদান ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৩৯

বোমারু বিমান ও কুষ্ঠরোগ—
চিঠির উত্তর আসেনি ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত ৪২

টুকরো খবর: স্কুল ব্যাগের ওজন কি কমবে? ৪৫

শব্দহীন মর্মবেদনা ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত ৪৬

এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সুবর্ণ জয়ন্তী
ও বাঙালি চিকিৎসক ডা.ঐন্দ্রিল ভৌমিক ৪৮

সাক্ষাৎকারভিত্তিক জীবনকথা: ডা. পুণ্যব্রত গুণ ও
ডা. দিলীপ মহলানবিশ পিয়ালী দে বিশ্বাস ৫২

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই: অভিজিৎ মিত্র
মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটি বিশ্বজিৎ মিত্র ৫৪

চিঠি ৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*র গ্রাহক হোন।
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফ্ট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFS Code: CNRB0000315
সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান
এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

মানুষের দিন কি ফুরিয়ে আসছে?

আজকের দিনে কিছু জিনিস আমরা ধরেই নিয়েছি। গুটিবসন্ত হবে না। টিকা দেওয়া থাকলে পোলিয়ো হবে না। চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য থাকলে, সামান্য কাটাছেঁড়ায় মরবে না কেউই, অপারেশন করতে গিয়ে সংক্রমণ হয়ে, বা বাচ্চা হতে গিয়ে সূতিকাজ্বরে মৃত্যু নেহাত ব্যতিক্রম হয়েই থাকবে। অথচ এটা বড়োজোর সাত দশকের ঘটনা, কিন্তু তার আগের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছি। যেমন সুইচ টিপলেই ঘরে আলো জ্বলে ওঠার সময় মনে থাকে না মাত্র আট দশক আগে খুব কম মানুষেরই ঘরে ইলেকট্রিক আলো ছিল, যেমন মোবাইলে কথা বলার সময়ে মনে থাকে না পঁচিশ বছর আগেও ঘরের টেলিফোনটি প্রায়ই যেত বিকল হয়ে, আর মাঝরাস্তায় থাকা মানুষটির খবর পাবার উপায় ছিল না কিছুই।

এখন যদি হঠাৎ করে দেশের কোত্থাও কারও ঘরে বিজলিবাতি না জ্বলে? হঠাৎ করে ফিরে যেতে হয় ঘরের কোণে বিকল থাকা সেই বড়ো কালো টেলিফোনের যুগে? অসম্ভব, তাই না? অথচ ফোনের চাইতে ঢের বেশি জরুরি, ঘরের বিজলিবাতির চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপারে আমাদের হাতের মুঠোয় থাকা প্রযুক্তি, আমাদের হাতের নাগালে থাকা প্রাণদায়ক একটি জিনিস, উধাও হয়ে যাচ্ছে। এবং, তাতে প্রায় কোনোরকম হেলদোল নেই আমাদের। জিনিসটি হল অ্যান্টিবায়োটিক।

অ্যান্টিবায়োটিক উধাও হয়ে যাচ্ছে? কেন, ওষুধের দোকানে গেলেই তো অ্যান্টিবায়োটিক মেলে, মেলে গণ্ডায় গণ্ডায়। আর দোকানদারের কথায়, নতুন ওষুধও আসছে হররোজ। সেটা উধাও হয়ে যাবে, এমন ভাবার কারণ আছে নাকি কোনো?

অ্যান্টিবায়োটিক উধাও হয়ে যাচ্ছে না, তা ঠিক। কিন্তু অকেজো হয়ে পড়ছে। আশি বছর আগে আবিষ্কার করা পেনিসিলিন ছিল যেন রূপকথার জীয়নকাঠি, ছোঁয়া পেলেই বেঁচে উঠত নানারকম জীবাণুর আক্রমণে মরোমরো সব রোগী। এখন ওষুধের দোকানে পেনিসিলিন মেলে না, কেননা ডাক্তাররা পেনিসিলিন লেখেন না। লেখেন না, কেননা পেনিসিলিনে জীবাণু মরে না, লিখতে হয় নতুন অ্যান্টিবায়োটিক, তারপর সেই অ্যান্টিবায়োটিকটি অকেজো হয়ে গেলে নতুনতর অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক। জীবাণুরা পেনিসিলিনে মরে না—পেনিসিলিন প্রতিরোধী। তারপর তারা নতুন অ্যান্টিবায়োটিকেও মরে না—নতুন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী। তারপর তারা নতুনতর, নতুনতম অ্যান্টিবায়োটিকেও প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এটা কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়, ডারউইন-কথিত প্রাকৃতিক নির্বাচন-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, এমনই হবার কথা।

একদিকে জীবাণুরা দ্রুততর হারে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে উঠছে, অন্যদিকে মানুষের ভাণ্ডারে আস্তে আস্তে অস্ত্র ফুরিয়ে আসছে, কমছে নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের হার।

তাহলে উপায়?

সেই নিয়েই এবার *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* অন্যতম প্রচ্ছদ-নিবন্ধ।

একটি অমৃতের অপমৃত্যু

অ্যান্টিবায়োটিক

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা

ডায়ালগ ১. "কী রে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করিস কেন? ঠান্ডা লাগল নাকি? অ্যান্টিবায়োটিক খা।"

ডায়ালগ ২. "ধুর!! ডাক্তার আবার কী অ্যান্টিবায়োটিক দেবে? ওই তো দু-পিস অগমেন্টিন লিখে ভিজিট নিয়ে নেবে . . . "

ডায়ালগ ৩. "খুব পেট মোচড়াচ্ছে দাদা, দুটো ও-টু দিন তো . . ."

ডায়ালগ ৪. "শালা, হারামজাদা ডাক্তার, বললাম গা-ম্যাজম্যাজ করছে, জ্বর আসছে . . . শুধু প্যারাসিটামল লিখে ছেড়ে দিল? অ্যান্টিবায়োটিক লিখল না যাতে আবার পরে একবার চেম্বারে ছুটতে হয় . . . (চার অক্ষর)"

নাঃ!! আজ আমি এগুলোর উত্তর দেওয়ার মুডে নেই। বরং একটা গল্প বলি শুনুন . . .

বেশি না, আজ থেকে মাত্র এক শতক আগে, সামান্য কাটাছেঁড়া বিষিয়ে মৃত্যু। প্রসবকালীন বা প্রসব-পরবর্তী সংক্রমণ মানেই শিয়রে শমন। যৌনতা-সংক্রান্ত-রোগ যেমন সিফিলিস মহামারি . . . । শল্য-চিকিৎসা মানেই অপারেশন পরবর্তী ইনফেকশন, এবং . . .

কলেরা, টিবি, পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ . . . ।.

সব মিলিয়ে 'জীবন বড়ো সস্তা'।

কতটা সস্তা, একটা উদাহরণ দিই— প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যুর হার এখনকার তুলনায় 'মাত্র' ৫০ গুণ বেশি!!

মানুষ তখন রোগের দাস। মানুষের অজ্ঞতা আর রোগের বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ জানার অপারগতার সুযোগ নিয়ে রমরমিয়ে চলছে ডাকিনীবিদ্যা, কালাজাদু, ওঝা, ঝাড়ফুঁক, পুরিয়ার রাজ।

তার অনেক অনেক দিন আগে মিশরীয়, ভারতীয় এবং প্রাচীন চৈনিক সভ্যতায় ছত্রাক দিয়ে সংক্রমণ রোধ করার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেসময় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ঊষাকাল মাত্র, অভিজ্ঞতানির্ভর চিকিৎসার যুগ। একজন রোগীর চিকিৎসা ঠিকভাবে হলে, সেই অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞান মিলিয়ে, সবার জন্য অনুরূপ চিকিৎসা ভাবার মতো জ্ঞান ছিল না, তা প্রয়োগ করার মতো প্রযুক্তি ছিল না। এগুলো ছিল অনেকটা কুলেখাড়া দিয়ে অ্যানিমিয়া সারানোর মতো। কাজে লাগে, কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রা, কার্যপদ্ধতি, বিপাকক্রিয়া, বহির্গমন পুরোপুরি না জানা গেলে একটি রাসায়নিক ওষুধ হয়ে উঠতে পারে না। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সেই মাত্রাটি এনেছে।

দিন গড়িয়েছে . . . মানুষ ভেবেছে . . . ভেবেছে . . . জয় আসেনি . . . কিন্তু এরপর . . .

১৯০৯ সালে জার্মান ডাক্তার Paul Ehrlich লক্ষ করেন কিছু বিশেষ রঞ্জক দিয়ে ব্যাকটিরিয়ার কোশের দেওয়াল রং করা যায়। আশ্চর্যজনকভাবে সেই রঞ্জক শুধু নির্দিষ্ট ক্ষতিকর জীবাণুকেই রং করে তাকে 'দাগী আসামি' বানিয়ে দেয়, শরীরের স্বাভাবিক কোশে কোনো দাগ লাগে না, তার কোনো ক্ষতি করে না। এটা দেখে তিনি মনে করেন, এমন কিছু রাসায়নিক তৈরি করা সম্ভব যা দিয়ে নির্দিষ্টভাবে ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করা যাবে। তিনি একটি আর্সেনিকঘটিত যৌগ ব্যবহার করে সিফিলিসে প্রাথমিক কিছু সাফল্য পান . . . কিন্তু জয় তখনও বহুদূর . . .।

যুদ্ধক্ষেত্রে পরবর্তী সৈনিক। আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। জন্ম ৬ আগস্ট, ১৮৮১। স্কটল্যান্ডের কৃষক পরিবার। আলেকজান্ডার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের চার সন্তানের তৃতীয়। ১৮৯৫ সালে পড়াশোনার জন্য লন্ডন এলেন। ১৯০৮ সালে সেন্ট মেরি মেডিক্যাল স্কুল থেকে গোল্ড মেডেলসহ ডাক্তারি পাশ করলেন। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ক্যাপ্টেন হিসেবে ফ্রান্সের ব্যাটেলফিল্ড হাসপাতালে কাজ করলেন। যুদ্ধে আহত সেনাদের মর্মান্তিক মৃত্যু অত্যন্ত কাছ থেকে দেখলেন। যুদ্ধের বিষিয়ে যাওয়া ঘা-তে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করাই ছিল দস্তুর। অ্যান্টিসেপটিক হল এমন রাসায়নিক যারা ব্যাকটিরিয়ার সরাসরি সংস্পর্শে এসে তাকে মেরে ফেলতে পারে। ফ্লেমিং মনে করলেন এভাবে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করে চামড়ার ওপরের সংক্রমণ প্রতিহত করা গেলেও গভীরতর ক্ষত অব্দি অ্যান্টিসেপটিকের প্রভাব পৌঁছোয় না বরং ক্ষতস্থানে শরীর নিঃসৃত উপকারী পদার্থগুলির আসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নিজে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাননি।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯১৮-তে আবার সেন্ট মেরিতে ফিরে

আসেন। ১৯২১-এ লাইসোজাইম উৎসেচকের আবিষ্কার তাঁর হাত ধরে। লাইসোজাইম হল শরীরের মধ্যে থাকা একরকম প্রোটিন যা ব্যাকটিরিয়াকে মারতে সক্ষম। ১৯২৮-এ ব্যাকটিরিয়োলজির অধ্যাপক হলেন ফ্লেমিং।

তারপর এল সেই মহাসন্ধিক্ষণ . . . ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গেলেন ফ্লেমিং। ল্যাবরেটরির বেঞ্চে থাকে থাকে সাজানো রইল স্ট্যাফাইলোকক্কাস (ঘা, ফোঁড়ার জীবাণু) ভরা পেট্রিডিশ। পেট্রিডিশ হল একরকম কাচের ডিশ যার ওপর ব্যাকটিরিয়াকে কালচার মিডিয়ায় রেখে, তার ওপর নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়। ফিরে এসে ফ্লেমিং দেখলেন তার মধ্যে একটি পেট্রিডিশে কখন কিছু ছত্রাক বাসা বেঁধেছে আর ছত্রাক যেখানে জন্মেছে তার চারদিকের ব্যাকটিরিয়ার দল যেন উবে গেছে! তার মানে এই ছত্রাক ব্যাকটিরিয়া-ঘাতক!!! অর্থাৎ অজান্তেই রচনা হয়ে গেল একটি মহাকাব্য যা পরে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বেদ হয়ে দাঁড়াবে, নতমস্তকে পাঠ করবে উত্তরকালের পৃথিবী। ফ্লেমিং সাহেব পেনিসিলিয়াম গোত্রের ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত এই রাসায়নিকের নাম দিলেন পেনিসিলিন।

এ ব্যাপারে ফ্লেমিং সাহেবের নিজের বক্তব্য শোনা যাক:

“. . . one sometimes finds what one is not looking for. When I woke-up just after dawn on Sep'28, 1928, I certainly didn’t plan to revolutionize all medicines by discovering the world’s first antibiotic or bacteria killer but I suppose that was exactly what I did.”।

গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তো হল কিন্তু সমস্যা মিটল না। প্রথমত, কালচার করে এই ছত্রাক তৈরি করতে সমস্যা হল। দ্বিতীয়ত, ছত্রাক থেকে তার জীবাণুঘাতী পদার্থ নিয়ে তৈরি হত ছত্রাক-জল। এই ছত্রাক-জল দিয়ে একটি সেপ্টিসিমিয়া আক্রান্ত পূর্ণবয়স্ক মানুষের চিকিৎসা করতে প্রায় ২০০০ লিটার ছত্রাক-জল প্রয়োজন হয়ে পড়ল যা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। ১৯৩১ সাল অব্দি চেষ্টা করে বিফল হয়ে তিনি প্রায় হাল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান একজন মাত্র মানুষের ওপর নির্ভর করে এগোয় না। প্রায় এক দশক পরে হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরি এবং আর্নস্ট বোরিস চেইন পেনিসিলিন পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আরও পরে নরম্যান হীটলে সঠিক পিএইচ (pH) বজায় রেখে পেনিসিলিন-দ্রবণ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এতজনের এত বছরের পরিশ্রম মিলে অমৃতের জন্ম!

কিছুদিন বাদেই সফল প্রয়োগ। আমেরিকার বস্টনে আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীর চর্ম-প্রতিস্থাপনের পর ইনফেকশনকে পেনিসিলিন প্রয়োগে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

হাজারে হাজারে আহত-সৈনিক পেনিসিলিনের কল্যাণে নতুন জীবন পেল। রোগের বিরুদ্ধে মানুষের জয়ের ইতিহাস রচিত হল।

জ্ঞানতপস্বীরা কত বিনয়ী হন তার পরিচয় পাওয়া যায় ফ্লেমিং সাহেবের কথায়। নিজের আবিষ্কারকে নিতান্তই ‘ফ্লেমিং মিথ’ বলে অভিহিত করে, আসল কৃতিত্ব ফ্লোরি এবং চেইন-কে দেন ফ্লেমিং। বলেন, ওঁরা ছাড়া গবেষণাগারের পর্যবেক্ষণ ওষুধের রূপ পেত না। যাই হোক, ১৯৪৫ সালে হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরি এবং আর্নস্ট বোরিস চেইন-এর সঙ্গে আলেকজান্ডার ফ্লেমিংও নোবেল পুরস্কার পেলেন, ১৯৪৬ সালে ফ্লেমিং পেলেন নাইট উপাধি।

কিন্তু শীতের পড়ন্ত রোদের মতো সুখের সে দিন শেষ হয়ে এল. . .

পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়ে গেছে। মানুষ তখন আক্ষরিক অর্থেই ‘অমৃতস্য পুত্রা’। রোগের বিরুদ্ধে জয়ের অন্যতম বড়ো অস্ত্রটি তার কুক্ষিগত। তার গায়ে তখন অযুত হস্তীর জোর, অস্ত্রে দধীচির শান। যত দুর্দমনীয় জীবাণু যারা এতদিন আতঙ্কের শাসন চালিয়ে গেছিল, নতুন অস্ত্রের কল্যাণে সব পরাভূত। তখন পেছন ফিরে তাকানোর দিন গেছে। অবিমৃষ্যকারিতার চরমে উঠে মুড়ি-মুড়কির মতো পেনিসিলিন ব্যবহার হয়েছে। গবাদিপশুর ওজন বাড়াতে অল্প পরিমাণে পেনিসিলিন ব্যবহার শুরু হল। এমনকী প্রসাধন সামগ্রী হিসেবেও! সুখের দিনে কেই-বা লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের মূল্য বোঝে . . .

জয়ের নেশায় মশগুল হয়ে আমরা খেয়ালই করিনি কখন জীবাণুর দল গোকুলে বেড়েছে। ‘বুদ্ধিমান’ জীবাণুরা অস্ত্রের হাত থেকে বাঁচার কৌশল রপ্ত করে ফেলেছে! নিজেদের চারদিকে গড়ে তুলেছে দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল . . . যে পাঁচিল ভেদ করে পেনিসিলিনের তরবারি পৌঁছোয় না। ১৯৪০ সাল। পেনিসিলিন প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়ার খোঁজ পাওয়া গেল। এই শক্তিশালী ব্যাকটিরিয়া বসে রইল না। বরং নিজেদের সাম্রাজ্য বাড়িয়ে চলল।

(বিধিসম্মত সর্তকীকরণ: জীবাণুরা সত্যিসত্যিই কিন্তু বুদ্ধিমান নয়, আর সাম্রাজ্যবিস্তার ইত্যাদি তারা বোঝেও না। আসলে ডারউইনীয় ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার, আর এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে পেনিসিলিন-প্রতিরোধী জীবাণুরা বেঁচে যায় ও বংশবৃদ্ধি করে বেশি সংখ্যায়। বারবার ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ বললে, সেটা খুব বিজ্ঞানসম্মত হবে ঠিকই, কিন্তু লেখার রস শুকিয়ে যাবে, তাই জীবাণুদের ওপর অমন সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র আরোপ করছি। সুধী পাঠকেরা নিজগুণে অপরাধ মার্জনা করবেন)।

১৯৪৫ সাল নাগাদ ফ্লেমিং একটি সভায় সতর্ক করলেন, পেনিসিলিনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার রোধ করতে না পারলে এমন একটা সময় আসবে যখন কোনো ব্যাকটিরিয়াকেই আর পেনিসিলিন দিয়ে রোধ করা যাবে না। সঠিক মাত্রার চেয়ে কম মাত্রা এবং সঠিক সময়ের চেয়ে কম সময়ের জন্য পেনিসিলিনের ব্যবহার সর্বনাশ ডেকে আনবে। সেক্ষেত্রে পেনিসিলিন-প্রতিরোধী জীবাণু দ্বারা কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী থাকবে আমাদের এই অসচেতনতা।

ভবিষ্যৎবাণী মেনে কয়েক বছরের মধ্যেই পেনিসিলিন প্রায়

অকেজো হয়ে গেল। তবুও আমাদের ঘুম ভাঙল না! কারণ সে আমাদের ছদ্ম-সুখের সময় . . .

১৯৪০-৬২ অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের স্বর্ণযুগ। আরও সাতটি নতুন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক হাতে পেয়ে গেছি আমরা। ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন আমাদের থোড়াই কেয়ার। একটা অ্যান্টিবায়োটিক গেছে তো কী . . . আমাদের অস্ত্রভাণ্ডারে তখন আরও অনেক ঝকঝকে অস্ত্র। আমরা ভেবেছি, সংক্রামক রোগের দিন শেষ হয়ে এল প্রায়। এবং তাল মিলিয়ে চলেছে যথেচ্ছাচার। আমরা ধরে নিয়েছি অ্যান্টিবায়োটিক আসলে প্রফেসর শঙ্কুর 'মিরাকিউরল' যে সবকিছু এক ফুঁয়ে ঠিক করে দেবে।

একটা মূর্খের দুনিয়ায় বাস করছিলাম আমরা। আর যেভাবে পৃথিবীতে বঞ্চিত-নিপীড়িতরা একদিন ঘুরে দাঁড়ায় সেভাবেই জীবাণুর দল উঠে দাঁড়িয়েছে ধীরে ধীরে। অ্যান্টিবায়োটিকের চাবুক ব্যাকটিরিয়াকে ভয় পাওয়াল যত না, চোয়াল শক্ত করাল তার হাজার গুণ। (আগের পৃষ্ঠার বিধিসম্মত সর্তকীকরণ দ্রষ্টব্য)।

অ্যান্টিবায়োটিকের সে স্বর্ণযুগের কথা আগে শোনা যাক। ১৯৫০ সালে আবিষ্কার হল টেট্রাসাইক্লিন। তারপর অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়েছে রকেট গতিতে। ১৯৫৩-তে এরিথ্রোমাইসিন, ১৯৬০-এ মেথিসিলিন, ১৯৬৭-তে জেন্টামাইসিন, ১৯৭২ সালে ভ্যাঙ্কোমাইসিন।

কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটিরিয়াও আসতে লাগল হু-হু করে। বুদ্ধিমান ব্যাকটিরিয়া নিজেদের জীনগত পরিবর্তন করে কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক ধ্বংসকারী উৎসেচক তৈরি করে নিজেদের রং বদলে ফেলতে লাগল। অ্যান্টিবায়োটিক শত্রু চিনতে পারল না অথবা চিনতে পারলেও তাদের শক্তিশালী বর্ম ভেদ করতে পারল না। ১৯৫০ সালে আবিষ্কার হওয়া টেট্রাসাইক্লিনের রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটিরিয়া এসে গেল ১৯৫৯-এ। তারপর, বাঁধভাঙা জলের মতো ১৯৬২-তে মেথিসিলিন, ৬৮-তে এরিথ্রোমাইসিন, ৭৯-তে জেন্টামাইসিন, ৮৮-তে ভ্যাঙ্কোমাইসিন প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেল।

ফলে কী হল? এতদিন আমরা ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে জানতাম না কিন্তু এবার আমরা শত্রু চিনি, লড়তে জানি কিন্তু আমাদের অস্ত্রগুলোয় মরচে পড়তে শুরু করল। ফলাফল সেই একই, আবার মৃত্যুর ভ্রূকুটি!! এবার মৃত্যু আরও যন্ত্রণাদায়ক, কেননা সব জেনেবুঝে এ আমাদের ইচ্ছাকৃত আত্মহনন।

একদিকে প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা বাড়তে লাগল উলটোদিকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের গতি শ্লথ হয়ে এল। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলিও অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির পেছনে টাকা ঢালতে পিছপা হল কারণ তারা খুব ভালো করেই বুঝে গেল আত্মহননের মনোভাব থেকে এখনও আমরা সরে আসিনি। নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে এলেই কয়েক বছরের মধ্যে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। আর দিনের পর দিন আরও আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি আমরা।

অপেক্ষাকৃত নতুন ওষুধগুলিও অকেজো হয়েছে দ্রুত। ১৯৮৫ সালে আবিষ্কার হওয়া সেফটাজিডিম প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেল দু-বছরের মধ্যেই। ১৯৯৬ সালের লিভোফ্লক্সাসিন শুরুর বছরেই রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটিরিয়ার খপ্পরে পড়ল। ২০০০ সালের লিনেজোলিডের আধিপত্য টিকে রইল মাত্র এক বছর। এবং, অত্যন্ত ভয়ের খবর, শেষ পনেরো বছরে আমরা মাত্র দু-টি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রুপ পেয়েছি। সেগুলির অবস্থাও ভরা-শ্রাবণের জোলো হাওয়ায় কাঁপতে থাকা প্রদীপ শিখাটির মতো। মেরোপেনেম-কোলিস্টিন ইত্যাদি ব্যাকটিরিয়ার দুনিয়ায় পরমাণু-বোমার মতো অস্ত্রকেও এড়িয়ে চলার কৌশল রপ্ত করে ফেলেছে বুদ্ধিমান ও কুচক্রী ব্যাকটিরিয়ার দল। এর প্রভাব পড়ছে মারাত্মক। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স সুনামির চেয়েও ভয়ংকর, হিরোশিমা-নাগাসাকির চেয়েও নৃশংস।

টিভি সিরিয়াল, রোব্বারকার খাসির ঝোল আর পাগলু ড্যান্স নিয়ে মেতে থাকা আপনি বুঝুন বা না-বুঝুন, ধ্বংস সমাগত।

এইবার কয়েকটা তথ্য পরপর সাজিয়ে দিই—

১. আমেরিকায় বছরে ২ মিলিয়ন মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হন এবং বছরে ২৩০০০ জন মারা যান।

২. ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ২০15 সালের তথ্য অনুযায়ী বাৎসরিক আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭১৬৮৯। প্রাণ যায় ৩৩১১০ জনের।

৩. ভারতের দিকে তাকাই। শুধু শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাৎসরিক ৫৮০০০। না, সংখ্যাটা আবার দেখুন . . . উঁহু, এবারও সংখ্যাটা দেখলেন কিন্তু ভাবার চেষ্টা করলেন না। চলুন, একটা উদাহরণ দিই। ধরুন,একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় ৫০ জনের প্রাণ গেল। আপনি ভয়ে শিউরে উঠবেন, তাই তো? এবার, ৫৮০০০ সংখ্যাটা আবার দেখুন। এরকম দুর্ঘটনা যদি প্রতিদিন ৩-টিরও বেশি করে ঘটে তবে সেটা বছরে ৫৮০০০-এ দাঁড়ায়। কী? শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা কিছু অনুভব করলেন? তাও এটা শুধুই শিশুমৃত্যুর তথ্য। পূর্ণবয়স্ক মানুষদেরও ধরলে সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবে নিন।

৪. ইংল্যান্ডে বছরে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়া সামলাতে অতিরিক্ত ১.৫ বিলিয়ন ইউরো খরচ হয়। ভারতীয় মুদ্রায় হিসেবটা আপনিই করুন। আমি অঙ্কে কাঁচা।

৫. অ্যান্টিবায়োটিক অপব্যবহার দ্রুত রোধ করা না গেলে ২০14-৫০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ৩০০ মিলিয়ন মানুষ বেঘোরে মারা পড়বেন। ২০৫০ সালের পর বছরে ন্যূনতম ১০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ হবে অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্স।

৬. কয়েকটি জীবাণুর কথা বলা যাক। ই.কোলাই—ভারতে ১৬% সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী। ক্লেবসিয়েলা, সিউডোমোনাস,

অ্যাসিনেটোব্যাকটরের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ৫০%, ৪১%, ৭০%।

জানিনা, পড়ার পর আপনার অভিজ্ঞতা কী হল। আমি লিখতে লিখতেই ভয় পাচ্ছি, খুব খুব ভয় পাচ্ছি।

একটু নিজের অভিজ্ঞতার গল্প বলি, শুনুন। বছর চারেকের ফুটফুটে একটা বাচ্চা সাধারণ সর্দিকাশি নিয়ে আউটডোরে দেখাতে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। দিন তিনেক বাদে আবার ফিরে আসে সে। এবার ধুম-জ্বর। সাথে শ্বাসকষ্ট। বুকের ছবিতে জ্বলজ্বল করতে থাকে সাদা সাদা ছোপ . . . নিউমোনিয়া। শিরায় ওষুধ দেওয়া ও অন্যান্য সহযোগী চিকিৎসা শুরু হয়। তাও চিকিৎসায় সাড়া মিলল না। উপরন্তু শ্বাসক্রিয়া মন্দিত হল। ভেন্টিলেটরে দিতে হল। না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ডাক্তারের গাফিলতি ছিল না। কারণ রক্তের রিপোর্ট বলল প্যান-রেজিস্ট্যান্ট ক্লেবসিয়েলা। অর্থাৎ এই জীবাণু কোনো অস্ত্রেই মরবে না!! এতজন চিকিৎসক মিলে স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। আর চোখের সামনে ফুটফুটে শিশুটির হৃৎস্পন্দন থেমে গেল একদিন।

এতটা পড়ার পর, হয়তো কেউ কেউ ভাবছেন, নাঃ!! আর যে কেউ যা করুন আমি এবার থেকে আমার বাড়ির কাউকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াব না, আমরা তো নিরাপদে থাকব!

ভুল করছেন স্যার!! ভুল করছেন ম্যাডাম!!!

এই লাইনগুলো ভালো করে পড়ুন,

রেজিস্ট্যান্স আপনার শরীরের নয়। রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটিরিয়ার। কাজেই শুধু আপনি নিয়ম মেনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলেই হবে না। কারণ, রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটিরিয়া আপনার শরীরে রেজিস্ট্যান্ট হয়েই ঢুকবে। আপনি নিয়ম মেনেছিলেন কিনা সেটা ব্যাকটিরিয়া জানে না। সে শুধু ধ্বংসের মন্ত্র জানে। অর্থাৎ, আপনি, আপনার পাশের বাড়ি, তার পাশের বাড়ি এবং সারা পৃথিবী যদি একসাথে সতর্ক না হয় কোনো লাভ নেই। নিয়ম না মানা মদনবাবুর শরীর থেকে আসা ব্যাকটিরিয়া নিয়ম মেনে চলা নরেনবাবুর শরীরে ঘাঁটি গাড়তে পারে অবলীলায়।

এতটা পড়ার পর যদি মনে হয় এই সিরিজটার নাম 'একটি ভয়ের গল্প' লিখলে আরও উপযুক্ত হত তাহলে আমার লিখে যাওয়া সার্থক।

* * *

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দেশলাই কাঠি' কবিতাটি মনে পড়ে?

"আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
এত নগণ্য—হয়ত চোখেও পড়িনা
তবু জেনো, মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ
বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস"

নব্য-হাতিয়ারে বলীয়ান হয়ে আমরা সামান্য দেশলাই কাঠির মতো অবজ্ঞা করেছি ব্যাকটিরিয়ার শক্তি। আমাদের অস্ত্রে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে তারা। আধপোড়া দেশলাই কাঠির মতো আমরা ছুঁড়ে ফেলেছি তাদের। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায়, ঘুরে দাঁড়িয়েছে ব্যাকটিরিয়ারা। অ্যান্টিবায়োটিক-অধীশ্বরের হুকুম উপেক্ষা করে থাবা বসিয়েছে তাদের সুরম্য ইমারতে। রক্তাক্ত করেছে শাসককে। তারপর তাদের অসহায় মুখের ওপর শুনিয়ে গিয়েছে বজ্রনির্ঘোষ:

"আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো তোমরা অনুভব করেছ বারংবার
তবু কেন বোঝো না, আমরা বন্দী থাকব না
তোমাদের পকেটে পকেটে
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে, দিগন্ত থেকে দিগন্তে
আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়
তা তো তোমরা জানোই, কিন্তু তোমরা তো জানো না
কবে আমরা জ্বলে উঠব সবাই
শেষবারের মত"

অতঃপর?

১. নিজে থেকে অথবা কোয়াক বা ওষুধ দোকানদারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না। ভালো করে শুনুন, একজন অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ডাক্তারও বিপুল মেডিক্যাল সায়েন্সের কাছে শিক্ষার্থী মাত্র। কাজেই 'ডাক্তার আর কী দেবে, ওই তো অগমেন্টিন . . .' ভাবাটা বন্ধ করুন। আপনার ওই অত্যধিক আত্মবিশ্বাস সর্বনাশ ডেকে আনছে। অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ একজন পাশ করা মর্ডান মেডিসিনের ডাক্তারের (যাকে ভুল করে আপনি অ্যালোপ্যাথি নামে জানেন) অর্থাৎ ন্যূনতম এমবিবিএস-এর পরামর্শ ছাড়া খাওয়াবেন না।

২. অ্যান্টিবায়োটিক লেখার জন্য ডাক্তারের ওপর চাপ দেওয়া বন্ধ করুন এবং অন্যান্য সবদিক থেকেই ডাক্তারের ঘাড়ে বন্দুক রাখার অভ্যেস ত্যাগ করুন। ডাক্তার যদি প্রতি মুহূর্তে চিকিৎসা করতে এসে নিগৃহীত হওয়ার ভয় পান তাহলে সবসময় চাইবেন যেনতেনপ্রকারেণ আপনার পেশেন্টকে বাড়ি পাঠাতে। বলা ভালো, ভালোয়-ভালোয় হাসপাতাল থেকে বের করে দিতে। তখনই মশা মারতে কামান দাগতে হবে। অর্থাৎ, জেনে-বুঝেই তিনি অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে অতিরিক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসা করে নিজের পিঠ সুরক্ষিত করতে চাইবেন। তাতে আপনি ডাক্তারের মুখ শুকিয়ে যেতে দেখে হেব্বি মজা পাবেন কিন্তু মূল্য চোকাবে গোটা সমাজ।

৩. গবাদি পশুদের ক্ষেত্রেও ওষুধ ব্যবহারের আগে সতর্ক হবেন। মার্কিন দেশে মোট অ্যান্টিবায়োটিক অপব্যবহারের ৮০%-ই হয় গবাদি

পশুদের ক্ষেত্রে এবং এইসব রাসায়নিকের ৭০% মানুষের জন্যও ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

৪. হাত ধোওয়া এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবজাতক, দুর্বল-অনাক্রম্যতা সংক্রান্ত রোগী, সংক্রামক রোগীদের ক্ষেত্রে সতর্ক হোন। নবজাতকের ইনফেকশন প্রতিরোধ করতে হাত ধোয়ার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নবজাতক বাড়িতে আসার পর পাড়াশুদ্ধ লোকজন বাড়িতে জমে যায়। বাচ্চাকে কোলে তুলে আদর করতে চান সবাই আর অজান্তেই বাইরের জামাকাপড়, নোংরা হাত থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। "তর ছ্যানার সনার গা নাকি লো? ক্ষয়েইবে?" এসব তির্যক মন্তব্যে পাত্তা দেবেন না। বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে হাত ধুয়ে তারপর বাচ্চাকে ধরতে দিন। পারতপক্ষে দু-তিনজন বাদ দিয়ে নবজাতককে নিয়ে বেশি নাড়াঘাঁটা করবেন না।

৫. অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ব্যাপারে আপনার ডাক্তারের কাছে জানতে চান। আদৌ দরকার আছে কিনা, হলে কতদিন কীভাবে খেতে হবে, সাইড এফেক্ট কী . . . জেনে নিন। যদিও আউটডোরের ২৫০-৩০০ পেশেন্টের মাঝে অভিমন্যু ডাক্তার কদ্দুর সময় দিয়ে উঠতে পারবেন সে বিষয়ে সংশয় ও বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। আর দয়া করে 'জ্বর হয়েছে, ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দিল না?' এইসব কথা বন্ধ করুন। জ্বর-জ্বালা অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবজনিত লক্ষণ নয়। আপনার ডাক্তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার শিখেছেন। আপনার গলা-ব্যথার ওষুধ দিয়ে বন্ধুর চিকিৎসা করবেন না। তাতে দু-জনেরই ক্ষতি হতে পারে।

৬. অপ্রয়োজনীয় ও অবৈজ্ঞানিক অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে জানুন। খুব বাজার চলতি ওফ্লক্সাসিন+অরনিডাজোল (ofloxacin+ornidazole), ওফ্লক্সাসিন+মেট্রোনিডাজোল (ofloxacin+metronizole), সেফিক্সিম+অ্যাজিথ্রোমাইসিন (cefixime+azithromycin) ইত্যাদি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ, পেটে ব্যথা থেকে নাকে ফুসকুড়ি অবধি সবেতেই যে আপনি দুটো ও-টু খেয়ে নেন, সেটা বন্ধ করুন। সবসময় পাশ করা ডাক্তাররাও গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসিপাতা তা বলব না। এসব ওষুধ অনেক পাশ করা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনেও পাওয়া যায়। সে বিষয়ে তর্ক তোলা রইল। অর্থাৎ, শুধু ডাক্তারের ওপর-ওপর জ্ঞান দেওয়া আর গুটিকয়েক মানুষের সচেতনতা দিয়ে হবে না। অ্যান্টিবায়োটিক-রেজিস্ট্যান্সের গল্প উঠে আসুক আপনার সান্ধ্য চায়ের আসরে, আপনার বাসে-ট্রেনের আড্ডায়, আপনার যাপনে . . .

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স-কে আর একটা বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে নিন।

ক্ষীণ আশার আলো দেখা যাচ্ছে . . .

সরকারের তরফে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সংক্রান্ত প্রোটোকল তৈরি হয়েছে। যদিও স্বাভাবিকভাবেই খাতার পাতা থেকে রাস্তার ধুলোয় নেমে আসতে এখনও বহু যোজন পথ হাঁটা বাকি। ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি বন্ধ করা সংক্রান্ত আইন আসছে। এগুলো উন্নত দেশে বহুদিন ধরেই আছে কিন্তু এই ঝাড়ফুঁক-তাবিজ-ক্রসপ্যাথি-পুরিয়ার দেশে এটা কদ্দুর কার্যকরী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। আমরা হোমিয়োপ্যাথি দিয়ে ক্যান্সার সারাই আর হরলিক্স-কমপ্ল্যান খেয়ে আন্ডারটেকারের শরীরে আইনস্টাইনের মাথা বানাই কিনা।

নতুন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

১. ফাজ থেরাপি: ফাজ ভাইরাস ব্যাকটিরিয়ার শত্রু। ছোটোবেলায় স্কুলে ম্যাডাম পড়িয়েছিলেন 'শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র'। ফাজ জীবনচক্রের একটি দশায় ব্যাকটিরিয়া কোশকে ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ব্যাকটিরিয়া মারা পড়ে।

২. ব্যাকটিরিয়োসিন: এক ধরনের পেপটাইড যা পোষকের ক্ষতি না করে নির্দিষ্ট ব্যাকটিরিয়ার দেওয়ালে ছিদ্র করে তাকে মেরে ফেলে।

৩. প্রিডেটর ব্যাকটিরিয়া : এই ঘাতক ব্যাকটিরিয়া (Bdellovibrio and like organism বা BALO) বিশেষত ক্ষতিকর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়াকে খেয়ে ফেলে।

৪. ন্যানোবোট টেকনোলজি : এটি একদম স্নাইপার রাইফেলের মতো। শরীরে প্রবেশের পর নিখুঁত দক্ষতায় ক্ষতিকর জীবাণুদের চিনে তাদের জেনেটিক কোড কেটে ফেলে। সেই জীবাণু আর বংশবিস্তার করতে পারে না।

যদিও এগুলো সবই পরীক্ষানিরীক্ষার পর্যায়েই আছে। ভারতের মতো গরিব দেশে এগুলি কতদূর ব্যবহার করা যাবে সে নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। আর একটি আশার কথা বলি, ব্যাকটিরিয়া যেমন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক চিনে সেগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে তেমনি পুরোনো অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর (যেগুলো অনেকদিন আগেই সে অকেজো করে ফেলেছিল তারা) কথা অনেক সময় ভুলেও যাচ্ছে। ফলে, অনেক সময় পরমাণু বোম সামলে নেওয়া ব্যাকটিরিয়া মারা পড়ছে পাথরের ছুরির আঘাতে!!

অর্থাৎ, এই পুরো আলোচনার মোদ্দাকথা একটাই . . . সিরিয়াল দেখুন বা হনুমান চালিশা পড়ুন, চ্যবনপ্রাশ খান বা কারণসুধা মাথায় রাখুন—

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া"

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

বাচ্চা মানুষ করার কয়েকটি টিপ্‌স

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা

১. শিশুর জন্মের পর প্রথম ৭-১০ দিনে জন্মের সময়ের ওজনের ৮-১০ শতাংশ ওজন কমে যায়। এটা একদম স্বাভাবিক। বিশেষত যে সব শিশু সঠিক সময়ের আগে (৩৭ গর্ভ-সপ্তাহের আগে) জন্মায় তাদের ক্ষেত্রে এই ওজন কমে যাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়।

২. শিশুকে চড়া রোদের তলায় রাখবেন না। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

৩. গর্ভাবস্থায় শরীরে প্রচুর জল জমে যায় ভেবে অনেকে মা-কে চড়া রোদে বসিয়ে আর জল কম খেতে দিয়ে শুকনো করার চেষ্টা করেন। করবেন না। জলের অভাবে বুকের দুধের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

গ্যাস!! মাথায়ও ওঠে না। হাঁটুতেও নামে না। দুগ্ধপোষ্য শিশুর অর্ধতরল পায়খানা লিভারের দোষে নয়।

৪. নবজাতক মধু খেয়ে মিষ্টভাষী হয় না। বরং এতে পেটে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে।

৫. পেচ্ছাব করার আগে কান্না মানেই মূত্রনালীর সংক্রমণ নয়। মূত্রথলি ভর্তি হয়ে গেলে বাচ্চা অস্বস্তির কারণে কাঁদতে পারে। পেচ্ছাব হয়ে গেলে এই কান্না ঠিক হয়ে যায়। পেচ্ছাব হওয়ার সময় কান্না নিয়ে বরং চিন্তা থাকে। বুঝতে না পারলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৬. শিশুকে জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই তেল মাখানো যেতে পারে। সুগন্ধীবিহীন নারকেল তেল দিয়েই হালকা মালিশ করতে পারেন।

৭. সরষের তেল মাখানো যাবে না। সরষের তেল রান্না করা, মাছ ভাজার জন্য। বাচ্চাকে মাখানোর জন্য নয়। “সরষের তেল দিয়ে বাচ্চার ঠান্ডা কম লাগে আর নারকেল তেল দিলে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু হয়ে যায়”—ভুল ধারণা। বরং সরষের তেলের ইরিট্যান্ট থেকে বাচ্চার র‍্যাশ বেরোতে পারে।

৮. নাভির নাড়ি খসে না পড়া অব্দি স্পঞ্জিং করুন। জন্মের ২৪ ঘণ্টা পর থেকেই স্পঞ্জিং শুরু করা যায়। নাড়ি খসে গেলে স্নান করান। প্রথমে ২-৩ দিন ছাড়া করালেও ক্ষতি নেই। মাথায় সবার শেষে জল

শিশুকে যত্ন করা মানে সারাদিন আঁচলে ঢেকে রাখা নয়। দু-বার আছাড় খাক, তিনবার হাঁটু ছড়ুক, ধুলোমাটি একটু ঘাঁটুক . . . প্রকৃতির সাথে বেড়ে ওঠাটাও একটা শিক্ষা।

লাগাবেন। মুছে ফেলবেন সবার আগে। ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে স্নান বন্ধ করবেন না। অপরিষ্কার ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে।

৯. পাউডার জাতীয় কিছু দেবেন না। বোরিক অ্যাসিড মেশানো কোনো কসমেটিকস দেওয়া নৈব নৈব চ। কাজল দেবেন না। চোখে তো নয়ই, মুখের কোথাওই দেওয়া ঠিক নয়। কাজল দিয়ে সব 'নজর' আটকে গেলে এত খরচ করে হাসপাতাল আর ডাক্তার বানানোর দরকার পড়ত না।

১০. প্রথম ছ-মাসে শুধুই বুকের দুধ। 'পেট ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, বাচ্চা খিদেয় শুকিয়ে যাচ্ছে, বুকে দুধ নেই, এগুলো অধিকাংশ সময় ভুল ধারণা। যে বাচ্চা দিনে ন্যূনতম ৬-৭ বার পেচ্ছাব করছে, দুধ খেয়ে ২-৩ ঘণ্টা ঘুমোচ্ছে এবং ওজন বাড়ছে, তার বুকের দুধের খেতে সমস্যা হচ্ছে না। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বাইরের দুধ দেওয়া যাবে না।

১১. দুধ তোলা মানেই বমি নয়। সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চাও সারাদিনে ৮-১০ বার বা তারও বেশিবার দুধ তুলতে পারে। ওজন ঠিক থাকলে এবং অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে দুধ তোলা নিয়ে ভয়

মোটা হওয়া মানে স্বাস্থ্য হওয়া নয়। মুটিয়ে যাওয়া কিংবা হাড় জিরজিরে হয়ে যাওয়া দু-টিই অস্বাস্থ্য। দুনিয়ার ফাস্ট ফুড আর প্যাকেটের খাবার খাইয়ে শিশুকে জ্যান্ত ফুটবল বানাবেন না।

পাওয়ার কিচ্ছু নেই। বমির সাথে তফাত করতে না পারলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন বলাই বাহুল্য।

১২. দুধ খাওয়ার পরে পরেই অল্প অল্প করে সারাদিনে ১৫-২০ বার পায়খানা করাও অস্বাভাবিক নয়। এটা অনেকটা রাস্তার ট্রাফিকের মতো। পাকস্থলীতে খাবার এলেই সংকেত যায় রাস্তা পরিষ্কার করার। ফলস্বরূপ বৃহদন্ত্রের মধ্যে জমে থাকা মল বেরিয়ে যায়।

১৩. এবং গ্যাস!! মাথায়ও ওঠে না। হাঁটুতেও নামে না।

১৪. দুগ্ধপোষ্য শিশুর অর্ধতরল পায়খানা লিভারের দোষে নয়। লিভার টনিক খাইয়ে লিভারকে শক্তিশালী করে ডাম্বেল তোলার উপযুক্ত করা যাবে ভাবলে ভুল করছেন।

১৫. সামান্য কয়েকটি গুরুতর অসুখ ছাড়া বুকের দুধ কখনোই বন্ধ করার দরকার হয় না। মায়ের সামান্য জ্বর-সর্দি-কাশি এসবের জন্য তো নয়ই।

১৬. এক বছর বয়সের আগে গোরুর দুধ না দেওয়াই ভালো। বাজারচলতি প্যাকেটের গুঁড়ো খাইয়ে টলার-স্ট্রংগার-শার্পার করা যায় না। রবি ঠাকুর আর আইনস্টাইনের সময় এগুলো বাজারে ছিল না।

১৭. কলা বা টক জাতীয় ফল খেয়ে ঠান্ডা লাগে না। বরং তার মধ্যে থাকা প্রচুর পরিমাণ খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

১৮. মোটা হওয়া মানে স্বাস্থ্য হওয়া নয়। মুটিয়ে যাওয়া কিংবা হাড় জিরজিরে হয়ে যাওয়া দু-টিই অস্বাস্থ্য। দুনিয়ার ফাস্ট ফুড আর প্যাকেটের খাবার খাইয়ে শিশুকে জ্যান্ত ফুটবল বানাবেন না।

১৯. এক বছর বয়েসের পর স্বাভাবিকভাবেই শিশুর বৃদ্ধিহার কমে আসে। ওজন বাড়ছে না ভেবে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। এতে শিশুটি খাবার দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়তে পারে।

২০. নিয়ম মেনে ভ্যাকসিন দিন। নিজে নিজে বা পাড়ার কোয়াকের

দুধ তোলা মানেই বমি নয়। সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চাও সারাদিনে ৮-১০ বার বা তারও বেশিবার দুধ তুলতে পারে।

পরামর্শে মুড়ি মুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না। মনে করিয়ে দিই, শুধু ভারতে বছরে ৫৮০০০ শিশু অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে মারা যায়। শিশুকে যত্ন করা মানে সারাদিন আঁচলে ঢেকে রাখা নয়। দু-বার আছাড় খাক, তিনবার হাঁটু ছড়ুক, ধুলোমাটি একটু ঘাঁটুক . . . প্রকৃতির সাথে বেড়ে ওঠাটাও একটা শিক্ষা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসা।

নবজাতকের যত্ন-আত্তি: তেল মালিশ

ডা. স্বপন বিশ্বাস

শিশু জন্মানোর পরে প্রত্যেক মা-বাবা চিন্তায় থাকেন কীভাবে তারা শিশুর যত্ন করবেন। শিশুকে কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয় এই নিয়ে তারা দোটানায় থাকেন। পাড়া প্রতিবেশীরা এক এক জনে একেক রকমের উপদেশ দেন, তার সবকিছুই যে বিজ্ঞানসম্মত, তা নয়। তা ছাড়াও কিছু চিরাচরিত প্রথা আছে, যেমন স্নান করানো, তেল মালিশ করা, জল খাওয়ানো, মধু খাওয়ানো ইত্যাদি। এগুলো কী করা উচিত বা উচিত নয়, তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিজ্ঞানের আলোকে। এবারের আলোচ্য তেল মালিশ করা।

শিশুকে মালিশ করার প্রথা ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকায় আছে। তবে বিহার বা উত্তর প্রদেশ এলাকায় একটু বেশি। তারা নতুন শিশুকে রোদ্দুরে রেখে বেশ ঘসে ঘসে সারা শরীরে সর্ষের তেল মালিশ করেন। তাদের ধারণা, এতে শিশু শক্তপোক্ত হয়, আর তেল মালিশ করলে ঘুমও ভালো হয়।

ধারনাটি কম-বেশি ঠিক। শিশুকে মালিশ করা দরকার। তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে। নিয়ম মেনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মালিশ করলে শিশুর উপকারই হয়। ঐতিহাসিক তথ্যে দেখা যায়, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও চীনে এই শিশু মালিশের প্রচলন ছিল।

তেল মালিশের উপকারিতা

ক. শিশুর পেশি মজবুত হয়: মালিশ করা মানে শিশুর সারা শরীরের মাংশপেশিকে বার বার নাড়িয়ে দেওয়া। এর ফলে পেশিতে রক্ত চলাচল বাড়ে ও পেশি সুদৃঢ় এবং সবল হয়। পেশির জোর বা টোন বাড়ে। তাই নিয়ম করে প্রতিদিন শিশুকে অন্তত ১৫-২০ মিনিট মালিশ করা দরকার।

খ. শরীরের গঠন ও শিশুর বৃদ্ধি শুধু পেশিই নয়, সারা শরীরে রক্ত চলাচলের ফলে শরীরের গঠন ভালো হয় এবং শিশুর বৃদ্ধি দ্রুত হয়।

গ. মা-শিশুর সম্পর্ক প্রতিদিন মা তার শিশুর সাথে এই যে একান্তভাবে সময় কাটায়, কোনো খেলনা পুতুল নয়, একটা জীবন্ত পুতুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে—যে তার একান্ত নিজস্ব, তাকে নিয়ে হাসে, খেলে, শিশুও মায়ের সাথে হাসে, খেলে—এতে মা ও শিশুর মধ্যে একটা বন্ডিং বা ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হয়। মা তার শিশুর

ভালো-মন্দ সহজে বুঝতে পারে। শিশু মা-কে চেনে, তার অনুগত হয়, মায়ের বাধ্য হয়।

ঘ. মুখের চারপাশে মালিশের ফলে শিশুর দাঁতের মাঢ়ীর উপকার হয়, দাঁতের ব্যথা কমে।

ঙ. মালিশের পরে শিশুর সারা শরীর শিথিল হয়, তার ঘুম ভালো হয়। ভালো ঘুম হলে শিশুর বিরক্তিভাব কমে, ঘ্যান ঘ্যান কম করে।

চ. শুধু শিশু নয়, মা-ও নিশ্চিন্ত থাকেন, মায়েরও ঘুম ভালো হয়।

ছ. কম ওজনের ও অপুষ্ট শিশুর ক্ষেত্রে মালিশ বেশি উপকারী। তাদের ওজন তাড়াতাড়ি বাড়ে।

জ. মালিশের ফলে "ভেগাস" নার্ভ উত্তেজিত হয়। এই নার্ভ আমাদের বাইরের সাথে ভিতরের সংযোগ রক্ষা করে। "ভেগাস" নার্ভ উত্তেজনার ফলে হজমের রস ক্ষরিত হয়। তাই মালিশ করলে পরোক্ষে শিশুর হজম ভালো হয়।

ঝ. মালিশের ফলে স্নায়ুতন্ত্র সবল হয়, অপরিণত শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ তাড়াতাড়ি হয়।

ঞ. মালিশ শিশুর হার্ট রেট বা হৃদ স্পন্দন ঠিক রাখে।

কবে থেকে শুরু করবেন, কখন করবেন?

শিশুকে তেল মালিশ জন্মের পর থেকেই শুরু করবেন না। ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ বয়সের পরে এবং ওজন ৩ কেজির বেশি হলে শুরু করবেন। মালিশের কোনো নির্দিষ্টি সময় নেই যে সকালে করলে ভালো বা বিকালে ভালো। তবে সাধারণত সকালে স্নানের আগে করলে ভালো হয়। রাতে খাবার আগেও করা যায়।

কোন তেল দিয়ে মালিশ করা উচিত ?

শিশুর ত্বক খুব নরম ও পাতলা। মালিশের সময় তেল ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে সেই ত্বকের ক্ষতি না হয়। তেল লাগিয়ে মালিশ করলে শিশুর ত্বক পিচ্ছিল হয় এবং হাত সহজেই সরে যায়। কিছুটা তেল অবশ্য শিশুর নরম চামড়া ভেদ করে শরীরে ঢোকে। তাই সেই সব তেল ব্যবহার করতে হবে, যাতে শিশুর উপকার হয়। আবার কিছু তেল শিশুর মুখেও চলে যেতে পারে, তাই যে সব তেলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে, সেই তেল ব্যবহার করা উচিত নয়।

সাধারণভাবে যেকোনো ভোজ্য তেল, অলিভ অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, নারকেল তেল বা তিলের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্যানোলা, কর্নফ্লাওয়ার তেলও ব্যবহার করা যাবে।

মালিশ করার সময় শিশুকে এমন জায়গায় রাখতে হবে, যেখানে বাতাস চলাচল করে না। কারণ খালি গায়ে মালিশ করার সময়ে বেশি হাওয়া লাগলে শিশুর ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।

খাবার পর বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মালিশ করা ঠিক নয়। সাধারণত খাবার এক ঘণ্টা পর শিশু যখন খেলার মুডে থাকে, তখন মালিশ করা ভালো।

এক এক বারে কমপক্ষে ১৫-২০ মিনিট ধরে মালিশ করতে হবে। বেশি হলেও ক্ষতি নেই।

কী দিয়ে মালিশ করবেন না?

➢ **সর্ষের তেল:** সর্ষের তেল বর্জন করুন, কারণ সর্ষের তেল ঝাঁঝালো, এতে শিশুর চোখ জ্বালা করতে পারে, চামড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

➢ **বাদাম তেল:** বাদাম তেলের ভিতরে এক ধরনের প্রোটিন থাকে, যার থেকে চামড়ায় অ্যালার্জি বা র‍্যাশ হতে পারে।

➢ **জলে দ্রবণীয় ক্রিম:** এগুলোর মধ্যে ডিটারজেন্ট জাতীয় পদার্থ থাকে, যা চামড়ার ক্ষতি করতে পারে।

➢ কোনো ঘি, আলমন্ড ওয়েল, বাদাম তেল, বা খনিজ তেল (যেমন তরল পেট্রোলিয়াম, সাদা তেল বা তরল প্যারাফিন তেল) ব্যবহার করা যাবে না। এই সব তেল শিশুর লোমকূপের গোড়া বন্ধ করে দেয়। তার চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেবি অয়েল সাধারণত বিভিন্ন খনিজ তেলে সুগন্ধি মিশিয়ে করা হয়, তাই এ সব ব্যবহার করার আগে দেখে নিতে হবে।

কীভাবে মালিশ করবেন?

মালিশ করার কোনো বাধা-ধরা নিয়ম নেই। তবে এমনভাবে মালিশ করতে হবে, যাতে সারা শরীরের পেশিই যেন উপকৃত হয়। এ ভাবে করতে পারেন—

☞ প্রথমে পা থেকে শুরু করে এক হাতে শিশুর গোড়ালি ধরে অন্য হাত দিয়ে উপরের থাই থেকে ধীরে ধীরে মালিশ করতে করতে নীচে নামতে হবে এবং মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাংশপেশি চেপে দিতে হবে, যেমন করে গোরুর দুধ দোয়ায়। তারপর আবার নীচে থেকে উপরে উঠতে হবে।

☞ এরপর মাথার দুই পাশ থেকে দুই হাত দিয়ে হালকা ম্যাসাজ করতে করতে নীচের দিকে শরীরের পাশ দিয়ে গোড়ালি পর্যন্ত নামতে হবে। এর পর পায়ের আঙুল। বেশ কয়েক বার এরকম করতে হবে।

☞ **মুখ:** নমস্কার করার মতো দুই হাত এক করে শিশুর কপালের মাঝখানে রেখে সেখান থেকে ধীরে ধীরে কানের দিকে হালকা চাপ দিয়ে আঙুল সরাতে হবে। বুড়ো আঙুল বা অন্য আঙুল দিয়ে উপরের ও নীচের ঠোঁট, চিবুক হালকা করে বার বার ম্যাসাজ করতে হবে।

☞ **বুক:** শিশুর দুই বুকের দু-দিকে দুহাত রেখে পর্যায় ক্রমে উপরে থেকে নীচে ও নীচে থেকে উপরে মালিশ করা যায়।

☞ **পেট:** পেটের উপর হাত রেখে প্রথমে সারা পেটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মালিশ করুন। তারপর পেটের একদিক থেকে অন্য দিকে হাতের আঙুল দিয়ে বিলি কাটার মত করে মালিশ করুন।

☞ **পিঠ:** পেটের মতো পিঠেও উপরে নীচে এবং পাশে পাশে মালিশ করুন।

মনে রাখার কথা

⅄ শিশুর মালিশ শিশু পরিচর্যার একটি অঙ্গ। তাই আপনার সারা দিনের কাজের হিসাবের মধ্যে এটাকে জুড়ে দিন। আপনি ও শিশু দু-জনেই যখন নিশ্চিন্ত থাকবেন, তখন এটি করুন।

⅄ এমন জায়গা পছন্দ করুন, যেখানে তাপ বা গরম খুব বেশি থাকবে না, আবার ঠান্ডাও হবে না। আর শিশুর গায়ে মালিশের সময় রোদ লাগা ভালো। চামড়ায় সরাসরি রোদ লাগলে ভিটামিন "ডি" তৈরি হয়, যা শিশুর হাড় গঠনে সাহায্য করে।

⅄ মালিশের সময় শিশুর সাথে কথা বলুন, বা হালকা গান করুন।

⅄ আস্তে আস্তে মালিশ করুন। শিশুর যেন ব্যথা না লাগে, বেশি হাত পা ধরে টানাটানি করবেন না। বেশি টানলে জয়েন্ট থেকে হাড় সরে যেতে পারে, ডিসলোকেশান হতে পারে।

সব দিক দিয়েই শিশুর মালিশ শিশুর পক্ষে উপকারী। আগে জন্মানো শিশুর ক্ষেত্রে আরও বেশি উপকারী। তাই শিশুকে নিয়মত মালিশ করান। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. স্বপন কুমার বিশ্বাস, এমবিএস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। একটা সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

ক্যান্সার নিয়ে সহজপাঠ

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত

ক্যান্সার কিন্তু একটা মাত্র অসুখ নয়। ক্যান্সার হল একগুচ্ছ অসুখ যেখানে মানবদেহের যেকোনো স্থানে যেকোনো ধরনের কোশ-কলার অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন ও পরিবর্ধন হয়। বেশ কয়েকটি দশা পেরিয়ে ক্যান্সার তার চূড়ান্ত রূপ নেয়। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা কোশ-কলার প্রকার ভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রোগ লক্ষণ ও উপসর্গযুক্ত ক্যান্সার হয়। সেই অনুযায়ী এদের চিকিৎসা ও পরিচর্যা পদ্ধতিও আলাদা।

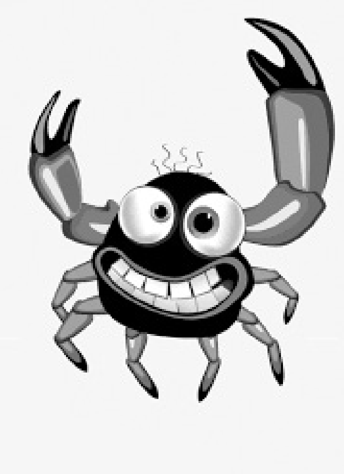

বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের কারণ বিভিন্ন। সব কারণগুলিকে চিহ্নিত করা না গেলেও বিজ্ঞান অনেক কিছুই চিহ্নিত করেছে। সাধারণ অর্থে অন্তত ক্যান্সার সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ব্যাধি নয় (যদিও কিছু সংক্রমণ কিছু ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়)। ক্যান্সার হল মূলত অসংক্রামক ব্যাধি, যার সঙ্গে লাইফস্টাইল বা জীবনশৈলী জড়িত আছে।

ক্যান্সার সংক্রান্ত জাতীয় কর্মসূচির অধীনে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা পরিচালিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে উচ্চতর স্তরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলিতে মূলত তিন ধরনের ক্যান্সারের নির্ণয় ও চিকিৎসার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে: ব্রেস্ট বা স্তন ক্যান্সার, সারভাইক্যাল বা জরায়ুমুখ-এর ক্যান্সার, ও ওরাল বা মুখগহ্বর-এর ক্যান্সার।

সঠিক সময়ে ধরা পড়লে ও উপযুক্ত চিকিৎসা নিলে এই তিন ধরনের ক্যান্সারের সারভাইভাল রেট বা বেঁচে থাকার হার বেশ ভালোই। যেমন প্রাথমিক অবস্থায় ধরা গেলে ওরাল, ব্রেস্ট ও সারভাইক্যাল ক্যান্সারের ৫ বছর বেঁচে থাকার হার যথাক্রমে ৬০.২%, ৭৬.৩% এবং ৭৩.২%।

সারা পৃথিবীর ক্যান্সারে আক্রান্তদের মধ্যে ৭.২% ভারতে। কিন্তু ক্যান্সারে মৃত্যুর মধ্যে ৮.৩% ভারতে। এ থেকে আমাদের দেশে দ্রুত ক্যান্সার নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।

ক্যান্সারের কিছু বিপদ সংকেত বা শারীরিক লক্ষণ—

১. পায়খানা ও পেচ্ছাব করার অভ্যাসে কোনো পরিবর্তন;

২. শরীরের যেকোনো স্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ বা অন্য ধরনের নির্যাস ক্ষরণ;

৩. এমন কোনো ক্ষত বা ঘা, যা সহজে ভরাট হচ্ছে না;

৪. স্তন অথবা অন্যত্র কোনো পিণ্ড বা গুটলি;

৫. ক্রমাগত বদহজম বা ঢোঁক গিলতে কষ্ট;

৬. আঁচিল বা তিলের কোনো চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন;

৭. নাছোড়বান্দা কাশি বা গলার স্বরে পরিবর্তন বা স্বরভঙ্গ।

তিরিশ অতিক্রান্ত মহিলাদের প্রতি আবেদন যে তারা সহজেই স্তনের কয়েকটি পরীক্ষা নিজেই করতে পারেন যার সাহায্যে ক্যান্সার নির্ণয় দ্রুত হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন একটু প্রাইভেসি ও একটি বড়ো আয়না। পরীক্ষা করার সময় যেগুলো ভালো করে দেখবেন তা হল—

১. স্তন (স্তনবৃন্ত সমেত)-এর আকারে পরিবর্তন;

২. স্তনবৃন্ত ভেতরে ঢুকে যাওয়া, তার স্থানের পরিবর্তন বা আকার আকৃতির পরিবর্তন;

৩. স্তনবৃন্তের ওপরে বা চারপাশে কোনো ধরনের র‍্যাশ বা দাগ;

৪. স্তনের ত্বক কুঁচকে যাওয়া;

৫. স্তনে কোনো ধরনের লাম্প, পিণ্ড বা গুটলি;

৬. এক বা উভয় বৃন্ত থেকে ক্ষরণ;

৭. স্তন অথবা বগলে ক্রমাগত যন্ত্রণা।

ক্যান্সার হওয়া আর তাতে মরাবাঁচার সংখ্যাতত্ত্ব মূলত চিকিৎসক ও গবেষকরা তাদের প্রয়োজনে সংগ্রহ ও আলোচনা করেন। একজন ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের কাছে সংখ্যাতত্ত্বের খুব বেশি মূল্য নেই। পরিসংখ্যানবিদ্যায় প্রোবাবিলিটি বা সম্ভাব্যতা বলে একটি টার্ম আছে। আপনি ধরে নিন যে আপনি ওই অঙ্কের উজ্জ্বল দিকটাতে থাকবেন ।

মন ও শরীর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মনের জোর কীভাবে রুগীর শরীরে উপকার করে তার সবটা এখনও না জানা গেলেও এটা প্রমাণিত যে কাজ করে। তাই ক্যান্সার হলে ভেঙে পড়বেন না। মনের জোর বজায় রাখুন।

সজাগ থাকুন, স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন প্রথম সুযোগেই। নিজের চিকিৎসা নিজে না করাই ভালো। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, স্বাস্থ্য প্রশাসক।

স্তন ক্যান্সার: জ্ঞানবিকাশের এক যাত্রাপথ

ডা. অনুপম ব্রহ্ম

রোগ আমার। শরীর আমার। চিকিৎসা করছেন চিকিৎসক। এবার সেই চিকিৎসার যদি একের বেশি পদ্ধতি থেকে থাকে, তাহলে কোন পদ্ধতিতে চিকিৎসা হবে তা কে ঠিক করবেন? একদিকে চিকিৎসকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; অন্যদিকে আমার ইচ্ছে, স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শরীরের অধিকার। বিতর্কটা আজকের নয়[১]।

রোজ কাশনার। আমেরিকান সাংবাদিক। ১৯৭৪ সালে স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ল। সেই সময় স্তনের টিউমারের প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে সম্পূর্ণ স্তন বাদ দিয়ে দেওয়া। “র‍্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি”। অনেক সময়েই রোগীকে না জানিয়ে। অপারেশন হয়ে গেলে জ্ঞান ফেরার পর রোগী জানতে পারলেন তাঁর একটা অঙ্গ নেই, যা হয়তো নারীত্বের প্রতীক। কাশনার রোগটা সম্পর্কে পড়াশুনো করলেন। টিউমার মানেই ক্যান্সার না-ও হতে পারে। শরীরের কোনো অংশে কিছু কোশের মাত্রাতিরিক্ত, অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন হল নিওপ্লাসিয়া। নিওপ্লাসিয়া যদি উৎপত্তির জায়গাতেই আটকে থাকে, তবে তা হল বিনাইন নিওপ্লাসিয়া। আর যদি শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তবে তা হল ম্যালিগন্যান্ট। শরীরের অনেকরকম টিস্যুর মধ্যে এপিথিলিয়াল টিস্যুর ম্যালিগন্যান্ট নিওপ্লাসিয়াকে বলে কার্সিনোমা, সাধারণ কথায় ক্যান্সার। এই নিওপ্লাসিয়ার ফলে কোনো অংশে কিছু কোশ জমে ফুলে যায়। শরীরের যেকোনো জায়গায় কোশ জমে ফোলা হল টিউমার।

চিত্র ১.

স্তন টিউমারের কারণ যদি বিনাইন নিওপ্লাসিয়া হয়, তবে সেইটুকু ফোলা জায়গা শল্যচিকিৎসা করে বাদ দিলেও তো চলে। সম্পূর্ণ স্তন বাদ দেওয়ার কী দরকার? টিউমার পাওয়া গেলে বায়োপ্সি হোক। যদি দেখা যায় তা ক্যান্সার, তবেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। তা-ও রোগীকে জানিয়ে। মানসিকভাবে তৈরি হওয়ার সুযোগ দিয়ে। কাশনারের লেখালেখি চলল। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ নড়েচড়ে বসল। ১৯৭৯ সালে তারা জানাল স্তন টিউমারের চিকিৎসায় সবসময় “র‍্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি” দরকার না-ও হতে পারে। চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ধারণ-নীতিতে অ-চিকিৎসক রোগীর জয় হল।

ক্যান্সার নিয়ে আমাদের আজ যে জ্ঞান, তা অনেকসময়েই স্তন ক্যান্সার নিয়ে চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। মিশরে ৩৫০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে লেখা দুটো প্যাপাইরাসে এই রোগের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে।[২] “এডউইন-স্মিথ সার্জিক্যাল প্যাপাইরাস” এক পুরুষ রোগীর কথা বলছে, যার সমস্যা হল “a prominent head in his chest” (আজ্ঞে হ্যাঁ, বিরল হলেও স্তন ক্যান্সার পুরুষদেরও হতে পারে); আর “এবার’স প্যাপাইরাস” একে কিছু রক্তনালিকার ফোলা বলে বর্ণনা করছে। প্রাচীন অ্যাসিরিয়া আর গ্রিসের কিছু চিকিৎসা পুথি, আর আমাদের সুশ্রুত সংহিতাও রোগটা সম্পর্কে লেখালেখি করেছে।

প্রাচীন চিকিৎসকদের মধ্যে সেলেব্রিটি হচ্ছেন হিপোক্রেটিস। তাঁর মতে শরীরের যাবতীয় রোগের উৎস হল রক্ত, শ্লেষ্মা, কালো আর হলুদ পিত্ত—এই চার রকম দেহরসের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা। কালো পিত্ত মাত্রার চেয়ে বেশি জমে গেলে স্তন ক্যান্সার হতে পারে। তিনি অবশ্য এর চিকিৎসায় শল্যচিকিৎসার বিরোধী। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। পরবর্তীতে গ্রিস দেশেরই গ্যালেন এবং অন্যান্য হিপোক্রেটিস-ধারার ডাক্তাররা এই কালো পিত্ত মতবাদের সমর্থক। গ্যালেন বললেন যে মহিলাদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত—তাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এই কালো পিত্ত মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করলেন ১৬৮০ সালে নেদারল্যান্ডসের ফ্রাঙ্কো ডে লা বো, এবং ১৭৩০-এ প্যারিসের ক্লড ডিগেইস গেন্ড্রন। স্তন ক্যান্সার, তথা ক্যান্সারের উৎপত্তি সম্পর্কে এঁদের মত হল যথাক্রমে শরীরের অম্লত্ব-ক্ষারত্বের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, এবং স্নায়ু-গ্রন্থি-লসিকার মিলিতভাবে বেড়ে ওঠা। কাছাকাছি সময়ে ব্রিটেনের জন হান্টারও ক্যান্সারে লসিকার ভূমিকাকে সমর্থন করলেন।

ইতালির বার্নাডিও রামাৎজিনি পেশার সাথে রোগের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের আধিক্য। এই পর্যবেক্ষণ এবং গ্যালেনের স্তন ক্যান্সারে অনিয়মিত ঋতুস্রাবের ভূমিকা—এই দুই পর্যবেক্ষণই কিন্তু এই রোগে হরমোনের ভূমিকাকে সমর্থন করছে—যা এখন প্রমাণিত।

ফ্রান্সের রুডলফ ভিরচাও হচ্ছেন আধুনিক প্যাথলজির জনক। ক্যান্সার যে আসলে কিছু কোষের সমষ্টি, তা ইনিই প্রথম দেখালেন। এই সময় থেকে শল্যচিকিৎসার আগে রোগী এবং চিকিৎসকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। তাতে জীবাণু-সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে, এবং শল্যচিকিৎসা-পরবর্তী মৃত্যুহার কমতে থাকে। ১৮৮২ সালে জন হপকিন্স হাসপাতালে সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম হলস্টেড প্রথম 'র‍্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি' করলেন। স্তনের টিউমারের চিকিৎসায় এই অপারেশনের প্রয়োগ এরপর থেকেই চিকিৎসকদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে থাকে।[৩] ১৮৯৬-তে আবার একটা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হল। On Treatment of inoperable Cases of Carcinoma of the Mamma নামের সেই গবেষণাপত্রে ইংল্যান্ডের টমাস বেটসন জানালেন, স্তন থেকে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে—এমন রোগীদের ক্ষেত্রে তিনি শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে ডিম্বাশয় বাদ দিয়ে লক্ষ করেছেন, কোশ বিভাজনের হার কমে যাচ্ছে। ডিম্বাশয় থেকে বেরোয় ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন নামের দুই হরমোন। স্তন ক্যান্সারের বৃদ্ধিতে এই দুই হরমোনের ভূমিকা নিয়ে চিন্তাভাবনা ছিলই; গবেষণাপত্রটা সেই ধারণাকেই শক্ত করল, এবং পরবর্তীতে এর চিকিৎসায় 'হরমোনাল থেরাপি'-র দরজা খুলে দিল। এর মধ্যে আমেরিকার বার্নার্ড ফিশার আবার যথেচ্ছ র‍্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টোমির বিপক্ষে সওয়াল করলেন এবং শুধুমাত্র টিউমারটুকু বাদ দেওয়া, যাকে বলে "লাম্পেকটমি", তার যুক্তিসংগত প্রয়োগ চিকিৎসকদের মধ্যে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।[৪]

সত্তরের দশকে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি বেটি ফোর্ডের স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে। তিনি জনসমক্ষে এই নিয়ে আলোচনায় লজ্জা পাননি।

ক্যান্সার মানে কিছু কোশের অনিয়ন্ত্রিত-অনিয়মিত বিভাজন—এই কথাটা বারবার বলা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল এই বিভাজন শুরু হচ্ছে কীভাবে? কোশ বিভাজন ব্যাপারটা আসলে অনেকরকম জিনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। কোষের যাবতীয় কাজকর্মের হর্তা-কর্তা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ডিএনএ। জিন হচ্ছে এই ডি-এন-এ-রই তৈরি লম্বা শিকলের বিশেষ বিশেষ অংশ, যা কোনো একরকমের প্রোটিন তৈরি করে। তো, কোশ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে যে প্রোটিনগুলো, তাদের তৈরি করছে যে সমস্ত জিন, সেরকম কোনো জিনে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন হলেই কোশের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজন শুরু হতে পারে। সেরকম হঠাৎ-পরিবর্তনকে বলে মিউটেশন। এই মিউটেশন বংশগত ধারায় প্রজন্মের পর প্রজন্মে চলে যেতে পারে, আবার কোনো এক নির্দিষ্ট মানুষের মধ্যে হঠাৎ করেও দেখা দিতে পারে, পরিবেশগত প্রভাবে।

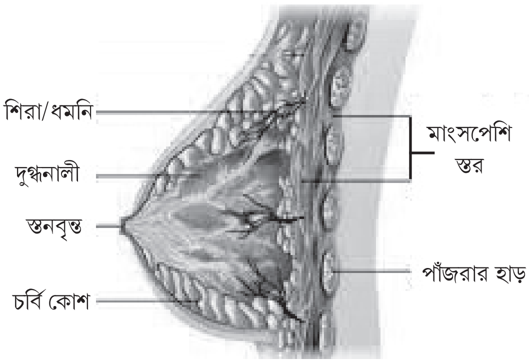

চিত্র ২. নারীর স্তনের গঠন

স্তনে ক্যান্সার তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে এরকম বেশ কিছু জিনের মিউটেশন। ১৯৮৭ সালে স্ল্যামন এবং তার সহযোগীরা দেখালেন neu জিনের মিউটেশন স্তনে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে। ১৯৯৪ সালে *সায়েন্স* পত্রিকায় BRCA1 এবং BRCA2 জিন মিউটেশনের কথা বললনে ইটসন এবং তার সহযোগীরা। স্তন এবং ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে এই মিউটেশন।

আর এই মিউটেশন যাদের রয়েছে, তারা যদি ওই অঙ্গ দু-টিই না রাখেন? ২০১৪ সালে *Breast Cancer* পত্রিকায় প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র বলছে এই মিউটেশনের বাহক মহিলারা যদি আগেভাগেই অঙ্গ দুটো শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেন, তবে ক্যান্সার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কমে যাবে। ২০১০ সালে *জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন*-এ প্রকাশিত আরেক গবেষণাপত্র বলেছিল এই মিউটেশনের বাহক এবং কোনো অপারেশন হয়নি, এমন মহিলাদের স্তন ক্যান্সার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা, অঙ্গ দু-টি বাদ দিয়েছেন এমন মহিলাদের তুলনায় ৮৪ শতাংশ বেশি।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মা স্তন ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন। জোলি তাঁর জেনেটিক পরীক্ষা করান এবং ধরা পড়ে তাঁর BRCA1 মিউটেশন রয়েছে। তিনি অপারেশন টেবিলে ওঠেন এবং দু-টি স্তনই শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেন। ২০১৩ সালে টাইম ম্যাগাজিনে এই খবর বেরোনো

মাত্র হই-হই পড়ে গেল। নামজাদা সুন্দরী, যার পেশাগত সাফল্য হয়তো অনেকটাই সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে আছে—তিনি এই সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারলে, আমরাও পারব, জেনেটিক পরীক্ষা করানোর ধুম পড়ে গেল। অপারেশন করানোর সিদ্ধান্ত ঠিক, না ভুল, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এই সচেতনতাটা দরকার ছিল।

আসলে স্তন ক্যান্সারের বিষয়ে সমাজে খোলামেলা আলোচনার অবকাশ সবসময়েই কম ছিল। সত্তরের দশকে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি বেটি ফোর্ডের স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ে। তিনি জনসমক্ষে এই নিয়ে আলোচনায় লজ্জা পাননি। সেই সময় পাশ্চাত্য সমাজে এই নিয়ে সচেতনতা ছড়ায়। কাছাকাছি সময়ে *Our Bodies, Ourselves* নামের একটা বই, এবং অবশ্যই রোজ কাশনারের লেখালেখি মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে ট্যাবু কাটাতে অনেকটা সাহায্য করেছিল। ১৯৮৩-তে ডালাসে প্রথমবার Komen Race for the Cure আয়োজিত হয়। আয়োজক ছিল The Susan G. Komen Breast Cancer Foundation। ১৯৮৬-তে কানাডিয়ান ব্রেস্ট ক্যান্সার ফাউন্ডেশন তৈরি হয়। স্তন ক্যান্সার নিয়ে সচেতনতা ছড়ানোর আন্তর্জাতিক প্রতীক হিসেবে "পিংক রিবন" চিহ্ন গৃহীত হয় ১৯৯১ সালে। অক্টোবরকে পালন করা হচ্ছে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে। সাধারণ জনসমষ্টি থেকে কোনো বিশেষ রোগে আক্রান্ত রোগীকে আলাদা করে নেওয়ার পদ্ধতিকে বলে "স্ক্রিনিং"। স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং-এর জন্যে জেনেটিক পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, ক্যান্সার তৈরি করতে পারে, এমন মিউটেশন রয়েছে কিনা; বিশেষত, পরিবারে সে রোগের ইতিহাস থাকলে। কিন্তু সে পরীক্ষা খরচসাপেক্ষ। অ্যাঞ্জেলিনা জোলি করাতে পারেন। আমি-আপনি করাতে গেলে দশবার ভাবতে হবে। তাই স্তন ক্যান্সারের সাথে লড়াইতে এখন জোর দেওয়া হচ্ছে স্ব-পরীক্ষায়। মহিলারা যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের স্তন পরীক্ষা করে দেখেন কোথাও কোনো ফোলাভাব আছে কিনা। শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়, হাত দিয়ে অনুভব করেও দেখতে হবে। নিয়মিত। যদি ফোলাভাব পাওয়া যায়, চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এরপর ম্যামোগ্রাফি (একরকম এক্স-রে) এবং এফ-এন-এ-সি (সূঁচের মাধ্যমে কিছু কোশ তুলে মাইক্রোস্কোপে দেখা) পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হবে সেই ফোলার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। অনেকসময় কোর-নিডল-বায়োপ্সিরও দরকার হতে পারে। এর উপর নির্ভর করবে শল্যচিকিৎসার সিদ্ধান্ত। স্তনের কতটা অংশ বাদ দেওয়া হবে, অপারেশনের আগে বা পরে রেডিয়েশন, কেমোথেরাপির দরকার পড়বে কিনা—এই সব সিদ্ধান্ত। রোগ যত আগে ধরা পড়বে, চিকিৎসার সাফল্যের সম্ভাবনা তত বেশি। সেখানেই সচেতনতার গুরুত্ব। রোগ নিয়ে খোলামেলা আলোচনার গুরুত্ব।

স্তন ক্যান্সারে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন—এই দুই হরমোনের ভূমিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই দুই হরমোন আবার কিছু প্রোটিনের মাধ্যমে স্তন এবং অন্যান্য অঙ্গের কোশের উপর কাজ করে। এই প্রোটিনগুলো হচ্ছে হরমোনগুলোর কাছে দরজার মতো, যার মাধ্যমে হরমোনগুলো কোষের ভেতরে ঢুকবে; এবং তারপর হয়তো কোশকে বিভাজিত হতে উদ্দীপিত করবে। এদের নাম ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন রিসেপটর (ER এবং PR)। এছাড়াও neu জিন যে প্রোটিনকে তৈরি করে, সেই HER2 প্রোটিনও এরকম দরজার মতো কাজ করে, আরেকটা কোশ বৃদ্ধি-সহায়ক প্রোটিনের ক্ষেত্রে, তার নাম এপিডারমাল গ্রোথ ফ্যাক্টর। স্তন ক্যান্সার ধরা পড়ার পর নিয়ম হচ্ছে দেখতে হবে সেই ক্যান্সার কোষগুলোর উপর এই ER, PR এবং HER2 প্রোটিন বেশি করে প্রকাশিত হয়েছে কিনা। যদি দেখা যায়, হ্যাঁ, হয়েছে, তবে ওষুধের মাধ্যমে এই প্রোটিনগুলোকে আটকে দেওয়া সম্ভব; দরজা বন্ধ করে দেওয়ার মতো। তবে ওই যা বলা হল, চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করছে রোগটা কত আগে ধরা পড়ছে তার উপর।

আপনার ক্ষেত্রে যে ওষুধ লাগল, আমার ক্ষেত্রে হয়তো তা লাগল না, কারণ রোগটা একই হলেও তার পেছনের কারণ দু-জনের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা। এখন গবেষকরা চেষ্টা চালাচ্ছেন, ঠিক কোন ধরনের মিউটেশনের ফলে ক্যান্সারটা তৈরি হল, তা বুঝে সেই ক্রোমোজোম স্তরে নেমে তা ঠিক করা, বা সেই অনুযায়ী ওষুধ দেওয়ার। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি personalised medicine-এর দিকে, যা হয়তো আরও অব্যর্থ হবে। আর অতীতের মতো আজও, সেই গবেষণার কেন্দ্রে রয়েছে স্তন ক্যান্সার সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা।

তথ্যসূত্র:

১. *Understanding Breast Cancer—The Long and Winding Road* (Kiven Erique Lukong) (BBA Clin. 2017 June)

২. *Commentary on the significance for modern neurology of the 17th century B.C. Surgical Papyrus.*(Helgason C.M) (*The Canadian Journal of Neurological Sciences*, 1987)

৩. *History of Breast Cancer Therapy, Medical Therapy of Breast Cancer.* (Rayter Z., Janine M.) [Cambridge University Press; 2003]

৪. *Five-year results of a randomized clinical trial comparing total mastectomy and segmental mastectomy with or without radiation in the treatment of breast cancer.* (Fisher B., Bauer M., Margolese R., Poisson R., Pilch Y., Redmond C., Fisher E., Wolmark N., Deutsch M., Montague E) (*New England Journal of Medicine*, 1985) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনুপম ব্রহ্ম, এমবিবিএস, প্যাথোলজিতে এমডি পাঠরত।

অ্যালার্জি: কারণ ও চিকিৎসা

ডা. জয়ন্ত দাস

চিত্র ১. অ্যালার্জি থেকে হাঁচি

সাধারণভাবে অ্যালার্জি বলতে আমরা কোনো খাবার বা বাইরে থেকে দেহে ঢোকা যেকোনো জিনিস থেকে দেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে বুঝি।

অ্যালার্জি খুব সাধারণ রোগ। শিশুদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি। বাচ্চারা বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্জির প্রবণতা কমে যায়, কিছু কিছু অ্যালার্জি চলেই যায়, কিন্তু কিছু অ্যালার্জি সারাজীবনও থাকতে পারে। আবার বড়ো বয়সে নতুন নতুন জিনিসে অ্যালার্জি হতে পারে।

অধিকাংশ অ্যালার্জিই মৃদু, তেমন সমস্যা করে না। সামান্য ওষুধ খেয়ে বা না খেয়েও, কয়েকদিন পরে চলে যায়। বেশিদিন ধরে থাকা জোরদার অ্যালার্জি কিন্তু খুব সমস্যা করে।

সাধারণ অ্যালার্জি কী কী থেকে হয়?

যেসব জিনিস থেকে অ্যালার্জি হয় তাদের বলে অ্যালার্জেন। সবথেকে সাধারণ অ্যালার্জেনগুলো হল:

ঘাস ও গাছের রেণু,

ঘরের ধুলোয় থাকা মাইট-জাতীয় পোকার দেহাংশ ও মল,

খাদ্যের মধ্যে নানাধরনের বাদাম, ফল, চিংড়ি-কাঁকড়া ও শেলফিশ, ডিম, এবং দুধ,

পোকার কামড় ও হুল-বেঁধানো,

ওষুধের মধ্যে বিশেষ করে আইব্রুপ্রোফেন, অ্যাসপিরিন, ও নানা অ্যান্টিবায়োটিক,

ল্যাটেক্স, যা গ্লাভস ও কনডোম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়,

মোল্ড-জাতীয় ছত্রাক,

বাড়িতে ব্যবহার করার নানা কেমিক্যাল, বিশেষত ডিটারজেন্ট আর কলপ।

মনে রাখতে হবে, এগুলোর থেকেও অধিকাংশ মানুষেরই অ্যালার্জি হয় না, কারও কারও হয়।

অ্যালার্জি হবার উপসর্গ কী কী?

অ্যালার্জেন-এর সংস্পর্শে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যে সাধারণত উপসর্গ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে যেগুলো বেশি দেখা যায় সেগুলো হল—

হাঁচি,

নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া,

চোখ লাল হয়ে চুলকানো ও জল পড়া,

কাশি, শ্বাসে টান ধরা,

চামড়ায় লাল হয়ে চুলকানো,

> অ্যালার্জি খুব সাধারণ রোগ। কিছু কিছু অ্যালার্জি চলেই যায়, কিন্তু কিছু অ্যালার্জি সারাজীবনও থাকতে পারে। আবার বড়ো বয়সে নতুন নতুন জিনিসে অ্যালার্জি হতে পারে।

আগে একজিমা থাকলে সেখানে বেশি চুলকানো,

আগে হাঁপানি থাকলে বেশি শ্বাসকষ্ট।

অধিকাংশ অ্যালার্জিতেই তেমন বাড়াবাড়ি হয় না, ওষুধ দিয়ে বা বিনা ওষুধেও, নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু প্রবল অ্যালার্জি বা ‘অ্যানাফাইল্যাক্সিস’ হলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ রোগ, যা থেকে মৃত্যুও হতে পারে।

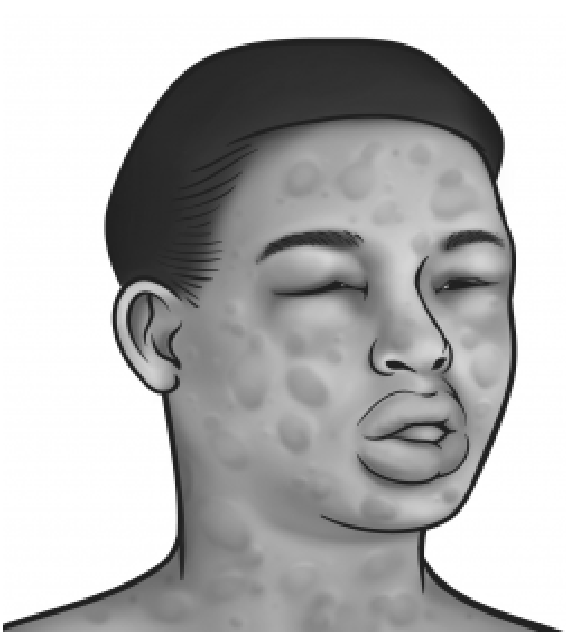

চিত্র ২. অ্যানাফাইল্যাক্সিস

বাড়াবাড়ি রকমের অ্যালার্জি বা অ্যানাফাইল্যাক্সিস

এতে প্রবল উপসর্গ হয়, যথা—

মুখ ও গলা ফোলা,
শ্বাসকষ্ট,
মাথা হালকা লাগা, মাথা ঘোরা,
চিন্তাভাবনা গুলিয়ে যাওয়া,
ঠোঁট ও চামড়া নীলাভ হয়ে যাওয়া,
মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া, জ্ঞান হারানো।

অ্যানাফাইল্যাক্সিস হলে দ্রুত চিকিৎসা দরকার, নইলে প্রাণ সংশয়ও হতে পারে।

কেন অ্যালার্জি হয়?

আমাদের দেহে রোগজীবাণু মারার জন্য একটা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আছে। কখনো কখনো সেই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ভুল করে রেণু, ডিম ইত্যাদি অক্ষতিকর জিনিস শরীরে ঢুকলে তার ওপর আক্রমণ চালায়। কেন এরকম হয় জানা নেই, কিন্তু এটাই হল অ্যালার্জি।

মা বাবা ভাই বোন প্রভৃতি নিকট আত্মীয়ের অ্যালার্জি থাকলে, অথবা হাঁপানি বা একজিমা থাকলে অ্যালার্জির সম্ভাবনা বাড়ে। দিনে দিনে অ্যালার্জি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, এর প্রকৃত কারণ জানা নেই। মনে করা হয় যত বেশি জীবাণুমুক্ত পরিবেশে ছোটোবেলা কাটানো হবে, দেহের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা রোগজীবাণুর সাক্ষাৎ তত কম পাবে, ও পরে ক্ষতিকর নয় এমন জিনিসের ওপর আক্রমণ চালাবে, অর্থাৎ অ্যালার্জি হবে।

নানা জিনিসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া মাত্রেই কি অ্যালার্জি?

না, তা নয়। কিন্তু তিনটে জিনিস সাধারণ মানুষ খুব গুলিয়ে ফেলেন। অ্যালার্জি, সেনসিটিভিটি ও ইনটলারেন্স।

অ্যালার্জি: এমনিতে ক্ষতি করে না, এমন বস্তুর বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আক্রমণ করে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করা।

সেনসিটিভিটি: একটা বস্তু এমনিতে শরীরের ওপর কিছু ক্রিয়া করে যেটা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু কারও কারও শরীরে সেই ক্রিয়ারই বাড়াবাড়ি হয় ও শারীরিক ক্ষতি হয়। যেমন কফি খেলে হৃদ্‌স্পন্দন সবারই একটু দ্রুত হয়, কিন্তু কফির ক্যাফিনে ‘সেনসিটিভিটি’ থাকলে হৃদ্‌স্পন্দন বাড়াবাড়ি রকমের দ্রুত হয়ে বুক ধড়পড় করে। শরীরের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ইনটলারেন্স: এখানে একটা বস্তু থেকে বিরূপ ক্রিয়া হয়, কিন্তু শরীরের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কোনো ভূমিকা নেই। যেমন অনেকের দুধ সহ্য হয় না, খেলে পেটব্যথা ও ডায়রিয়া হয়। একে বলে ‘ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স’, শরীরে একটা বিশেষ উৎসেচকের অভাবে এটা হয়। সাধারণত দ্রব্যটি (যেমন দুধ) সামান্য পরিমাণে শরীরে গেলে কোনো সমস্যা হয় না।

অ্যালার্জি কথাটার খটোমটো বাংলা প্রতিশব্দ আছে, ‘অতিসংবেদ্যতা’, তা এখানে ব্যবহার করছি না। ‘সেনসিটিভিটি’ কথাটা এমনি কথ্য ইংরাজিতেও চালু, তার বাংলা হল ‘সংবেদনশীলতা’ বা ‘বেদনতা’। আবার ‘ইনটলারেন্স’ কথাটাও কথ্য ইংরাজিতে চালু,

মা বাবা ভাই বোন প্রভৃতি নিকট আত্মীয়ের অ্যালার্জি থাকলে, অথবা হাঁপানি বা একজিমা থাকলে অ্যালার্জির সম্ভাবনা বাড়ে। দিনে দিনে অ্যালার্জি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, এর প্রকৃত কারণ জানা নেই।

বাংলায় বলে ‘অসহিষ্ণুতা’। এই কথাগুলোর অর্থ কাছাকাছি, কিন্তু ডাক্তারি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করলে তাদের অর্থ আলাদা আলাদা ও খুবই সুনির্দিষ্ট।

এর ফলে ডাক্তার ও রোগীর কথা বলার সময় অসুবিধা হয়। রোগী মুখে বলছেন অ্যালার্জি, আসলে হয়তো সেনসিটিভিটি, এমন হয়। ডাক্তারের কথাও রোগী নিজের মতো করে বুঝে নেন ও ভুল বোঝেন। আবার অনেক সময় ডাক্তাররা সহজ করে বলার খাতিরে চালু শব্দ ব্যবহার করেন, এগুলোর সব কিছুকেই এককথায় অ্যালার্জি বলে ছেড়ে দেন। এই সমস্যা কাটানো দুষ্কর।

চিকিৎসা

কীসে অ্যালার্জি ও কত প্রবল অ্যালার্জি, কীভাবে তা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছে, তার ওপর চিকিৎসা নির্ভর করে। আপনার চিকিৎসকই তা ঠিকভাবে বলতে পারবেন।

তবে মূলনীতি হল, যেসব জিনিসে অ্যালার্জি আছে সেগুলো চিহ্নিত করা ও এড়িয়ে চলা, আর উপসর্গ কমানো।

যেসব জিনিসে অ্যালার্জি আছে সেগুলো চিহ্নিত করা ও এড়িয়ে চলা—এটা বলা সহজ, কাজে কঠিন। খাবার থেকে অ্যালার্জি হলে তা ভালো করে রোগের ইতিহাস নিলে ধরা পড়ে, অনেক সময় রোগী নিজেই বলেন কোন জিনিস খাবার পর তাঁর অ্যালার্জি হয়েছে। সাধারণভাবে পোষা জন্তুর শরীরজাত নানা জিনিস থেকে অ্যালার্জি হয়। অ্যালার্জি রোগীর বাড়িতে পোষ্য রাখতেই যদি হয় তবে তাকে খুব পরিষ্কার রাখতে হবে আর যতটা সম্ভব বাড়ি-ঘরের বাইরে রাখতে হবে। বাড়িতে ড্যাম্প হলে মোল্ড-জাতীয় ছত্রাক বাড়ে ও তার থেকে অ্যালার্জি হয়—স্যাঁতলা ধরা বাড়িতে থাকবেন না, বাড়িতে হাওয়া-বাতাস চলাচল যথেষ্ট হওয়া চাই। আর যদি রেণু থেকে অ্যালার্জি হয় তো সেটা বছরের বিশেষ সময়ে (বসন্তকাল বা বর্ষাকাল) হবে, সে সময়ে বাড়ির মধ্যে জানালা দরজা বন্ধ করে থাকুন, ঘাস ও নানা গাছ-আগাছা বেশি আছে এমন জায়গায় না যাওয়াই ভালো।

আমাদের দেশে বাড়ির ধুলোয় যে মাইট-জাতীয় ছোট্ট পোকা থাকে তার দেহাংশ ও মল থেকে অ্যালার্জি খুব বেশি হয়। বাড়ির ধুলো এড়িয়ে চলা খুবই কঠিন, কিন্তু অন্য উপায় নেই। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখুন, অথচ ঝাঁট দেওয়া বা ঘর ঝাড়ার সময় বাড়িতে থাকবেন না। পারলে কেবল ফোম-জাতীয় (ধোয়া যায় এমন) কভার দেওয়া বিছানা ও সোফাই ব্যবহার করবেন, না পারলে অন্তত গরম জলে সমস্ত বেডকভার বেডশিট নিয়মিত কাচুন। কার্পেট নৈব নৈব চ।

অ্যালার্জির ওষুধ

আমাদের দেশে অধিকাংশ ওষুধের দোকানে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট নেই। তাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়, বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে। কোনো নতুন ওষুধ, যা জীবনে কখনো খাননি, সেটা কখনোই নিজে বা দোকানদারের পরামর্শে খাবেন না। অন্য কোনো রোগ থাকলে বা অন্য কোনো ওষুধ চললে, অ্যালার্জির প্রচলিত কোনো ওষুধ বিপদ ঘটাতে পারে। মদ খেলেও অ্যালার্জির ওষুধে সমস্যা হতে পারে।

অ্যান্টিহিস্টামিন—সাধারণত প্রথম ওষুধ হিসেবে অ্যান্টিহিস্টামিন দেওয়া হয়, আমাদের দেশে এর চালু নামই হল ‘অ্যালার্জির ওষুধ’। অ্যালার্জি হবার পরে এটা খাওয়া কার্যকর, আবার অ্যালার্জির আক্রমণ ঠেকাতে এটা খাওয়া যায়। ‘খাওয়া’ বলছি বটে, কিন্তু তেমন দরকারে এটা ইঞ্জেকশন হিসেবে নেওয়া যায়, বা নাকের স্প্রে বা চোখের ড্রপ হিসেবেও দেওয়া যায়।

ডিকনজেস্ট্যান্ট— নাকের জমা শ্লেষ্মাকে কমানোর জন্য এই ওষুধ মুখে খাবার ট্যাবলেট ইত্যাদি, এবং নাকের ড্রপ হিসেবে, পাওয়া যায়। একটানা একসপ্তাহের বেশি ব্যবহার না করাই ভালো।

লোশন, মলম ইত্যাদি— ক্যালামিন লোশন, শুকনো ত্বককে খানিক মোলায়েম করার ময়েশ্চারাইজার, এগুলো চামড়ার চুলকানি কমায়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এগুলো ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু ব্যবহার করে চুলকানি বেড়ে গেলে বা না কমলে, ডাক্তার দেখান। আর স্টেরয়েড মলম বা লোশন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করবেন না।

স্টেরয়েড

স্টেরয়েড নাকের ড্রপ নাকের জল ঝরা ও হাঁচি বন্ধ করতে সাহায্য করে, চোখের ড্রপ চোখ লাল হওয়া, চুলকানি-জ্বালা কমায়। স্টেরয়েড মলম ও লোশন নানা ধরনের একজিমায় কাজে লাগে (যেমন ‘স্পর্শজনিত অ্যালার্জিক একজিমা’—এটার কথা অন্য সময় বলব)। এগুলো দোকানে সহজে পাওয়া গেলেও চিকিৎসকের পরামর্শেই খাওয়া উচিত। বাড়াবাড়ি রকমের আমবাত বা অ্যাঞ্জিয়োইডিমা-তে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে স্টেরয়েড খেতে হতে পারে।

এছাড়া আছে ইম্যিউনোথেরাপি, ডিসেনসিটাইজেশন, আছে প্রবল অ্যালার্জি বা অ্যানাফাইল্যাক্সিস ও তার বিশেষ চিকিৎসা। সে-সব ডাক্তারদের জানার বিষয়, জটিলও। সেকথা এখানে বলছি না।

অ্যালার্জি টেস্ট

কীসের থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে সেটা ধরার জন্য অনেক সময় পরীক্ষা করতে হয়। আমাদের দেশে ‘অ্যালার্জি টেস্ট’ কথাটা খুব চালু। রোগীরা অনেক সময়েই বলেন—ডাক্তারবাবু, আমার অ্যালার্জি টেস্ট করিয়ে দেখুন না, কেন এমন হচ্ছে। অনেকে রক্তে ইয়োসিনোফিল বেশি থাকাকেই ‘অ্যালার্জি টেস্ট’ ইতিবাচক বলে ধরে নেন, কেউ-বা রক্তে ‘ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই’ নামক অ্যান্টিবডির উচ্চ মান-কেই অ্যালার্জি-র যথেষ্ট টেস্ট বলে ভাবেন। এগুলোর কোনোটাই ‘অ্যালার্জি টেস্ট’ নয়।

আবার কেউ কেউ প্রথমেই একতাড়া ছাপানো রিপোর্ট সামনে ফেলে দেন, বলেন—ডাক্তারবাবু, আমার এইসব অ্যালার্জি আছে, আর আমি তাই এত কিছু মেনে চলছি। সেগুলো ‘অ্যালার্জি টেস্ট’ বটে, কিন্তু এসব টেস্টের মধ্যে অধিকাংশই তেমন কাজের নয়, এবং টেস্ট বা পরীক্ষার ফল ব্যাখ্যাও তত সহজ নয়।

ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর জনশিক্ষার ওয়েবসাইট (https://www.nhs.uk/conditions/allergies/) সরাসরি বলেছে, ও দেশে কমার্শিয়াল অ্যালার্জি টেস্টিং কিট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া

চিত্র ৩.

যায় না, সরকারি ব্যবস্থায় যে অ্যালার্জি টেস্টিং কিট ব্যবহার হয় তার চেয়ে ওগুলো নিম্নমানের, ওর ওপর ভরসা করা যায় না। আরও বলেছে, অ্যালার্জি টেস্ট-এর ফল ব্যাখ্যা সেই ডাক্তারই করতে পারেন যিনি আপনার রোগের ব্যাপারে খুব ভালোভাবে জানেন। অর্থাৎ আপনার রক্ত নেওয়া হল, আপনার মুখও না দেখে ল্যাবরেটরিতে বসে কেউ রিপোর্টে লিখে দিলেন—“এটা খাবেন না, ওটা এড়িয়ে চলুন”—সেটা কাজের ব্যাপার নয়।

এ দেশে সরকারি ব্যবস্থায় অ্যালার্জি টেস্টিং তেমন নেই। বেসরকারি ব্যবস্থায় যা চলছে তা হল রক্ত পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিতে বসে রিপোর্টে লিখে দেওয়া—“এটা খাবেন না, ওটা এড়িয়ে চলুন”। এসব টেস্টের মধ্যে গুণমানের তফাত আছে, কিন্তু তেমন কোনো নিয়ামক সংস্থা নেই যারা বলবেন কোথাকার কোন পরীক্ষাটা তুলনায় ভালো। ফলে ডাক্তাররা যা জানেন বোঝেন তার ভিত্তিতে অ্যালার্জি টেস্ট করান। তার ফলাফল অবশ্য নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায় না, অনেক ডাক্তারই তা মেনে নেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউ কেউ মানেন। আর

‘অ্যালার্জি টেস্টিং’ নিয়ে এদেশের মানুষের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা আছে, যার ফলে অবৈজ্ঞানিকভাবে টেস্টিং খুব প্রচলিত, সেটা বদলানো সম্ভব

রোগীদের প্রায় সবার ছাপানো রিপোর্টের ওপর বড়ো বেশি ভরসা।

এটা মাথায় রেখে তবেই অ্যালার্জি টেস্ট বিষয়টা বুঝতে হবে। নানা ধরনের অ্যালার্জি টেস্ট আছে। যে টেস্ট-ই করা হোক না কেন, কোন কারণে করা হচ্ছে, রোগীর ইতিহাস ও রোগলক্ষণ কী, ও তাঁর পরিবেশে কোন অ্যালার্জেন থাকতে পারে, সেটা জানা জরুরি।

নানারকমের টেস্টের মধ্যে আছে—

চামড়ায় সূচ ফুটিয়ে পরীক্ষা (Skin prick testing)—আমাদের দেশে কমই হয়।

রক্তের অ্যালার্জি পরীক্ষা (Blood tests)—আমাদের দেশে খুব বেশিই হয়, কিন্তু গুণমানের ঠিক নেই ও রিপোর্টে ঠিকমতো ব্যাখ্যা থাকে না।

চামড়ায় প্যাচ টেস্ট (Patch tests)—আমাদের দেশে কম হয়। স্পর্শজনিত অ্যালার্জিক একজিমার জন্য কার্যকর পরীক্ষা।

খাদ্য বেছে বেছে বাদ দেওয়া (Elimination diet)—এটা ল্যাবরেটরি টেস্ট নয়, তাই রোগীরা অনেক সময় এটাকে ‘টেস্ট’ বলে মানতেই চান না। এতে রোগীর ইতিহাস নিয়ে যদি মনে হয় কোনো খাদ্য থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে তবে সেটাকে বাদ দিয়ে কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা হয় রোগলক্ষণ কমল কিনা। এখানকার ডাক্তাররা এই টেস্টটা খুবই করেন।

চ্যালেঞ্জ টেস্ট (Challenge testing)—এটা আগের পরীক্ষার ঠিক বিপরীত। যদি কোনো কিছু (সাধারণত খাদ্য) থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে মনে হয়, তবে সেটা দিয়ে (খাইয়ে) দেখা হয় রোগলক্ষণ বাড়ল কিনা। এটাতে একটু ঝুঁকি আছে ও রোগীকে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে হয় রোগলক্ষণ বাড়লে কী করবেন, বা তাঁকে ভর্তি করে রাখতে হয়। এখানকার ডাক্তাররা এই টেস্ট-টা করেন, রোগী যথারীতি বুঝতে চান না যে এটাও টেস্ট।

মোদ্দা কথা হল, অ্যালার্জি একটা রোগের নাম নয়, এটা হল একটা শারীরিক প্রক্রিয়ার নাম। অ্যালার্জি থেকে নানারকমের রোগ হতে পারে, যেমন নাকের জল ঝরা, সর্দিকাশি জ্বর, হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্ট, চামড়ায় আমবাত, চোখে জ্বলা-চুলকানি ও জল পড়া ইত্যাদি। অনেক অ্যালার্জি ক্ষণস্থায়ী, চিকিৎসা ছাড়াই বা অল্প চিকিৎসাতে সেরে যায়। আবার অ্যাঞ্জিয়োইডিমা ও অ্যানাফাইল্যাক্সিস হল গুরুতর অসুখ, জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা না করলে এমনকী প্রাণঘাতীও হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের সামান্য অ্যালার্জি-তে ডাক্তার ছাড়াও চিকিৎসা করানো যেতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই নিরাপদ। ‘অ্যালার্জি টেস্টিং’ নিয়ে এদেশের মানুষের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা আছে, যার ফলে অবৈজ্ঞানিকভাবে টেস্টিং খুব প্রচলিত, সেটা বদলানো সম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

[এই লেখাটির জন্য https://www.nhs.uk/conditions/allergies/ ওয়েবসাইটের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।]

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

নিউমোনিয়া

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

প্রদাহ মানে শরীরের কোনো কোশ-কলা ফুলে যাওয়া, লাল ও গরম হয়ে যাওয়া আর ব্যথা হওয়া। নিউমোনিয়া হল একটা বা দুটো ফুসফুসের কোশ-কলার প্রদাহ। শ্বাসনালী বিভাজিত হতে হতে অন্তিম শাখার শেষে থাকে হাওয়ার থলি। নিউমোনিয়ায় এই থলিগুলোর প্রদাহ হয়, এগুলো তরলে ভরে যায়।

সাধারণত নিউমোনিয়া ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণে হয়। ভাইরাস সংক্রমণেও হতে পারে, অল্প কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাক সংক্রমণে।

নিউমোনিয়ার উপসর্গগুলো ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হঠাৎ করে দেখা দিতে পারে অথবা কয়েক দিন ধরে আস্তে আস্তে বাড়তে পারে।

নিউমোনিয়ার উপসর্গগুলো হল—

- কাশি—শুকনো কাশি হতে পারে অথবা ঘন হলুদ, সবুজ, খয়েরি বা রক্ত মেশানো কফ উঠতে পারে।
- শ্বাসকষ্ট—শ্বাসগতি বেড়ে যায়, গভীর শ্বাস নেওয়া যায় না। বিশ্রাম নেওয়ার সময়েও শ্বাসকষ্ট হয়।
- বুক ধড়ফড়ানি—নাড়ী অর্থাৎ হার্টের গতি বেড়ে যায়।
- জ্বর—শরীর খারাপ লাগে। ঘাম দেয়, কাঁপুনি লাগে। খিদে কমে যায়।
- বুকে ব্যথা—শ্বাস নেওয়া আর কাশার সময় বাড়ে।

এছাড়া যে কষ্টগুলো হতে পারে:

- কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা।
- মাথা ব্যথা।
- ক্লান্তি।
- বমিভাব বা বমি।
- বুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ।
- হাড়ের জোড়ে বা মাংসপেশিতে ব্যথা।
- বিশেষত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি।

নিউমোনিয়ার উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারের সহায়তা নিন। দ্রুত শ্বাসগতি, বুকে ব্যথা বা বিভ্রান্তি থাকলে জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারের পরামর্শ লাগবে।

বছরের যেকোনো সময়ে নিউমোনিয়া হতে পারে, কিন্তু বেশি হয় শরৎ এবং শীতকালে। যেকোনো বয়সেই নিউমোনিয়া হতে পারে কিন্তু বেশি হয় আর বেশি গুরুতর হয় খুব ছোটো শিশু এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের।

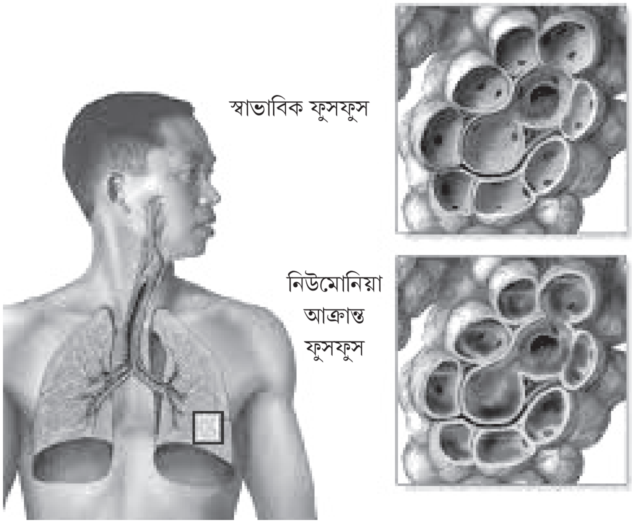

চিত্র ১. স্বাভাবিক ফুসফুস ও নিউমোনিয়া আক্রান্ত ফুসফুস

এদেরই বেশি হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হয়।

যাঁদের নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি:

- ছোটো বাচ্চা
- বৃদ্ধ-বৃদ্ধা
- ধূমপায়ী

যাঁদের এসব রোগ আছে—হাঁপানি, হার্ট কিডনি বা লিভারের রোগ, যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম—সম্প্রতি ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরনের কোনো রোগ হওয়ার জন্য, এইচআইভি/এডস, কেমোথেরাপি চলছে যাঁদের, অঙ্গপ্রতিস্থাপনের পর ওষুধ চলছে।

নিউমোনিয়ার উপসর্গগুলো হল—কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, জ্বর, বুকে ব্যথা।

শুরুতেই বলেছি সাধারণত নিউমোনিয়া হয় ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ থেকে। যে ব্যাকটিরিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি হয় তার নাম স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি। অন্যান্য দায়ী ব্যাকটিরিয়া হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি ও স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস।

চিত্র ২. নিউমোনিয়ার উপসর্গ

ভাইরাস থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে—রেস্পিরেটরি সিন্সিটিয়াল ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ এ বা বি। ভাইরাল নিউমোনিয়া বেশি দেখা যায় ছোটো বাচ্চাদের।

ছত্রাক থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাঁদের।

বমি, বাদামের মতো কোনো বাইরের জিনিস, ধোঁয়া বা রাসায়নিক শ্বাসপথে ঢুকে হয় অ্যাস্পিরেশন নিউমোনিয়া।

নিউমোনিয়া হতে পারে হাসপাতাল থেকেও। কোনো অন্য রোগ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন, বেরোলেন হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া নিয়ে। বিশেষত যাঁদের ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে এমনটা বেশি দেখা যায়, তখন নিউমোনিয়ার নাম ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া।

নিউমোনিয়ার রোগ নির্ণয়

➡ উপসর্গ শুনে আর স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুকের পরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করা যায়।

➡ নাড়ীর গতি ও শ্বাসগতি মাপা হয়। নিউমোনিয়ায় নাড়ীর গতির তুলনায় শ্বাসগতি বেশি বাড়ে।

➡ তাপমাত্রা দেখা হয়।

➡ বুকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শোনা যায়।

➡ আঙুল দিয়ে বুক ঠুকে দেখা হয় ফুসফুসে তরল জমেছে কিনা।

সামান্য নিউমোনিয়ায় কোনো ল্যাবরেটরি পরীক্ষার দরকার হয় না।

চিকিৎসা শুরুর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে রক্তপরীক্ষা, বুকের এক্স-রে, কফ পরীক্ষা করতে হতে পারে।

হাসপাতালে ভর্তি হতে হলে শিরায় জীবাণুনাশক ও তরল দেওয়া হয়, শ্বাসকষ্ট হলে অক্সিজেন দেওয়া হয়। শ্বাসকষ্ট বেশি হলে আইসিইউ-তে ভেন্টিলেটর-এর সহায়তা নিতে হতে পারে।

কারুকে কারুকে সেরে ওঠার পর ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা বা নিউমোকক্কাল টিকা নিতে বলা হয়।

নিউমোনিয়ার জটিলতা

☞ প্লুরিসি—ফুসফুসের আবরণীর প্রদাহ, যা থেকে শ্বাসকার্যের বিকলতা হতে পারে।

☞ লাং অ্যাবসেস—ফুসফুসে ফোঁড়া।

☞ খুব ছোটো বাচ্চা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং যাদের আগে থেকে ডায়াবেটিসের মতো কোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগ আছে, তাদের এইসব জটিলতা হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

চিকিৎসা

⇨ সামান্য নিউমোনিয়ায় বাড়িতে বিশ্রাম, জীবাণুনাশক ওষুধ এবং প্রচুর পরিমাণে তরল খেলেই চলে। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়।

⇨ শরীর ভালো লাগতে শুরু করলেই কোর্স পুরো না করে অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করা উচিত নয়। এতে জীবাণু ওষুধ-প্রতিরোধী হতে পারে।

যাঁদের নিউমোনিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি—ছোটো বাচ্চা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ধূমপায়ী। যাঁদের এসব রোগ আছে—হাঁপানি, হার্ট কিডনি বা লিভারের রোগ, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম . . .

⇨ কত গুরুতর আপনার জীবাণু সংক্রমণ, তার ওপর নির্ভর করবে কত তাড়াতাড়ি আপনি সেরে উঠবেন।

⇨ এক সপ্তাহে জ্বর সেরে যাওয়া উচিত।

⇨ চার সপ্তাহে বুকে ব্যথা ও কফ ওঠা অনেকটা কমা উচিত।

⇨ ছয় সপ্তাহে কাশি ও শ্বাসকষ্ট অনেকটা কমা উচিত।

⇨ তিনমাসে সব উপসর্গই ভালো হয়ে যাওয়া উচিত, তবু খুব ক্লান্তি অনুভব হতে পারে।

⇨ ছয় মাসে সাধারণত রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, জেনারেল ফিজিশিয়ান, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

খারাপ জিনের খপ্পরে

ডা. প্রলয় বসু

শীতের দুপুর, সময় প্রায় দুটো হবে। ফাঁকা হয়ে যাওয়া আউটডোরে বসে বসে একটা বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। যে চেয়ারটায় বসে আছি, তার পিছনেই জানালাটা দিয়ে একটা সুন্দর মিঠে রোদ্দুর এসে গায়ে পড়ছে। সবে "প্রবঞ্চক"-এর খপ্পরে পরেছি, হঠাৎ—

"ডাক্তারকাকু এসে গেছি"

চেনা গলা শুনে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখের উপর হাত চাপা দেওয়া একটা মুণ্ডু আর দুটো ক্ষুদ্র বিনুনি, শরীরটা পর্দার আড়ালে।

"তোর সাথে আড়ি, তুই প্রায় দু-মাস পরে এলি।"

আমার গলার আওয়াজ শুনে, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সটান আমার কোলে। পেছনেই স্বাতীর মা-বাবা।

"আমার চকলেট কই? আগে চকলেট, পরে কথা।"

কত্তো বড়ো হয়ে গেল! সময় কেমন বয়ে যায়! প্রথম দেখেছিলাম যখন আট মাস, এখন ছ-বছর! ব্যাগ হাতড়িয়ে একটাই পাওয়া গেল, হস্তান্তর হল। ব্যস আমার কোলে থেকে নেমে, বসার চেয়ারে গিয়ে স্বাতী ব্যস্ত হল চকলেট নিয়ে। আমি এবার হাত বাড়ালাম ওর মা-বাবার দিকে। বাবার কাঁধের ব্যাগটা থেকে একটা ফাইল বের হল আর একটা ডাইরি। ডাইরিটা আমার দিকে বাড়িয়ে, ফাইল থেকে একটা রিপোর্ট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ডাইরি বলছে, শেষ বার এসেছে ছয় সপ্তাহ আগে। রিপোর্ট বলছে, সাড়ে সাত, তাও দশ দিন আগের। মুখ খারাপের জন্য যথেষ্ট বদনাম আছে, তাও চোখেই কাজ সারলাম। লেখা হল ব্যবস্থাপত্র, স্বাতী ভর্তি হল। পাঁচটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরোতে যাব, পকেট হাতড়াচ্ছি, প্যাকেটটা দরজার বাইরে বের করব, পিছন থেকে ডাক—

"ডাক্তারবাবু, একটু কথা ছিল।"

অগত্যা, প্যাকেট পকেটের ভেতর অন্তর্হিত হল,

"বলুন।"

"আরেকটা বাচ্চা নিলে . . . "

"সমস্যা আছে . . . বিস্তর বকবক করতে হবে, ছবি আঁকতে হবে। কাল, সকালে, ঠিক দশটায় চলে আসুন। হ্যাঁ, ভালো কথা, স্বাতীর যাবতীয় পুরোনো রিপোর্ট নিয়ে আসবেন।"

ব্যস . . . রাতটা গেল। ভেবেছিলাম একটু "প্রবঞ্চক" নিয়ে সময় কাটাব, কিন্তু . . . কপাল! সারা জীবন শুনে এসেছি, রোগী ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করে, তা আমার কপাল! তেনারা এলেন যখন, এগারোটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। বুঝলাম পণ্ডশ্রম হতে চলেছে।

আগে জানতে হবে থ্যালাসেমিয়া রোগটা কী? কেন হয়? কী করে একটা বাচ্চার শরীরে আসে? তারপর ধাপে ধাপে বাকি সব . . . চলুন শুরু করা যাক।

খাতা, পেন, পেনসিল নিয়ে . . . রেডি . . . স্টেডি . . . গো . . .

দেখুন, এটুকু জানেন যে, এই রোগ হলে মাসে মাসে রক্ত দিতে হয়। সুতরাং, রোগটিতে শরীরের রক্ত কমে যায়, তাই রক্ত দিতে হচ্ছে।

"রক্ত কেন কমে? কোনোদিন তো এমন দেখলাম না, নাক, কান অথবা চোখ দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। তাহলে রক্ত কমে কী করে।"

টেস্ট ম্যাচের প্রথম বলেই বাউন্সার। রক্ত মানে এখানে লোহিত রক্ত কণিকা, তার আয়ু ১২০ দিন, তারপর জগতে লীন। না লীন নয়। ভেঙে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। কী হয়, তা একটু পরে বলছি। কিন্তু ভাঙে। এবং এক্ষেত্রে, এই রোগে, ভাঙে যখন ভাঙার কথা তার আগেই।

"কেন আগেই ভেঙে যায়?"

হুম। আবার হোঁচট। দাঁড়ান। এই যে স্বাতীর হিমোগ্লোবিন কম, এই যে সাড়ে সাত। এই হিমোগ্লোবিন নামটার মধ্যে দুটো নাম লুকিয়ে আছে। হিম আর গ্লোবিন। হিম, হইল গে, আয়রন, লোহা। আর গ্লোবিন? "দুষ্টু লোক"!

এই গ্লোবিন তৈরি হয়, এক জোড়া (দু-টি) আলফা, এক জোড়া (দু-টি) নন-আলফা দিয়ে। নন-আলফা তিন রকম: বিটা (β), গামা (γ) আর ডেল্টা (δ)।

অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিন (HbA1), মানে আমার রক্তে যেটা বেশি আছে, তাকে ভাঙলে পাব দুটো আলফা, আর দুটো বিটা। সাংকেতিক ভাষায় লিখলে (HbA1):$\alpha 2\beta 2$। আরেকরকম হিমোগ্লোবিন HbA2—(HbA2):$\alpha 2\delta 2$। আবার অন্যরকম হিমোগ্লোবিন হল ফিটাল হিমোগ্লোবিন (HbF):$\alpha 2\gamma 2$।

আমাদের রক্তে তিনটিই থাকে।

ধরুন, আপনার সামনে তিন জোড়া কাচের গ্লাস আছে, একদম একরকম দেখতে। এর মধ্যে তিন রকম পরিষ্কার, স্বচ্ছ পানীয় আছে। একটায় জল, একটাতে চিনি জল, আর অন্যটাতে নুন জল। এবার একটু দূর থেকে, গন্ধ না শুঁকে, না খেয়ে, বুঝতে পারবেন না কোনটায় কী আছে। গ্লাসগুলোকে আমরা আলফা ধরলাম। আর তার মধ্যের পানীয়গুলো—

জল (বিটা) + গ্লাস (আলফা) = HbA1

চিনি জল (ডেলটা) + গ্লাস (আলফা) = HbA2

নুন জল (গামা) + গ্লাস (আলফা) = HbF

পরীক্ষা করলে মানে, খেলে বুঝতে পারবেন কোনটাতে কী আছে।

এই গ্লাস আর পানীয় নিয়ে হল গ্লোবিন, এবং আপনি হাতের মুঠোয় পানীয় সমেত গ্লাস ধরলেন, আপনার হাত হল গে, হিম। সুতরাং তৈরি হল হিমোগ্লোবিন, বোঝা গেছে? আমরা যেমন জল, চিনি জল এবং নুন জল তিনটেই খাই, তেমনই আমাদের শরীরে তিনটিই, HbA1, HbA2, HbF আছে। আমাদের শরীরে সাধারণত এগুলো এইরকম অনুপাতে থাকে—HbA1: > ৯৫% (৯৫-৯৮%), HbA2: ১.৫-৩.৫%, HbF: < ২.৫%।

এবার, গ্লাস ফাটা, পানীয় বেরিয়ে যাবে। আলফা খারাপ, রক্ত ভেঙে যাবে। আলফা খারাপ হলে আলফা থ্যালাসেমিয়া। জল খারাপ, নোংরা জল, খাওয়া যাবে না। বিটা খারাপ, রক্ত ভেঙে যাবে। বিটা খারাপ হলে বিটা থ্যালাসেমিয়া। আলফা থ্যালাসেমিয়া আবার চার রকমের। বিটা-র ও চারটি শ্রেণি ভাগ আছে।

আলফা-র গল্প থাক, বেটির মানে বিটা-র গল্প হোক। এবার স্বাতীর সেই রিপোর্টটি বার করুন, যেটা দেখে বলেছিলাম, ওর রোগটা খারাপ, একমাত্র ওষুধ রক্ত। এই যে, হ্যাঁ, তাকান ভালো করে—

HbA1: ৩৪% (০-৮০% হতে পারে), HbA2: ২% (২-৭% হতে পারে), HbF: ৬৪% (২০-১০০% হতে পারে)

প্রেগনেন্ট অবস্থায় কি কোনোভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব?” সম্ভব। মায়ের পেটে বিশেষ জলের থলির মধ্যে বাচ্চা বড়ো হয়, সেই জল পরীক্ষা করে বোঝা সম্ভব। তবে অবশ্যই খরচ সাপেক্ষ।

যে পরীক্ষার রিপোর্ট এটা, সেই পরীক্ষার নাম হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস। তবে অন্যান্য আরও পদ্ধতিতেও পরীক্ষা করা যায়, যেমন একটু বেশি খরচ সাপেক্ষ এইচ পি এল সি (HPLC)। এ হল সাধারণ হিসেব। এর বাইরের অঢেল অসাধারণ হিসেব আছে, সেগুলো জানার কোনো মানে নেই। এতেই “হাফ মুন্নাভাই এমবিবিএস” হয়ে গেছেন। এবার শুনুন, এটি একটি “জিন” ঘটিত রোগ। এ “জিন” গল্পের পড়া হুরি-পরি নয়।

তো জিন কী?

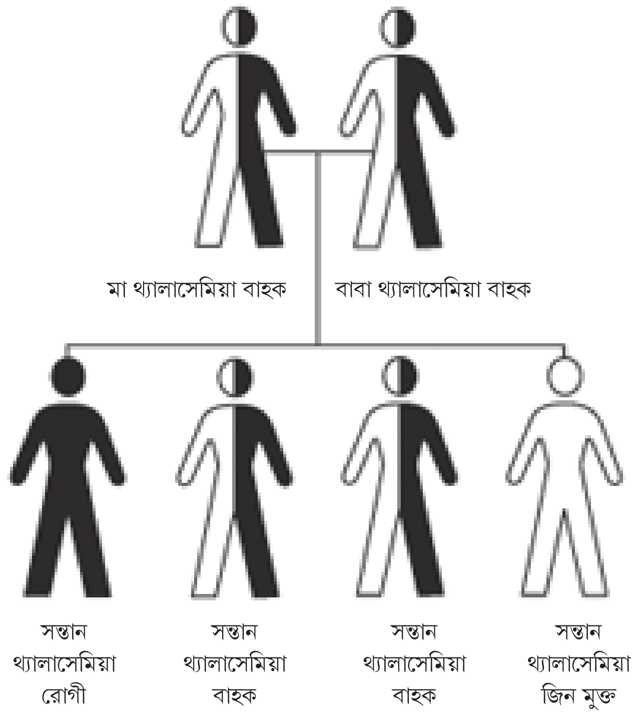

চিত্র ১. মা-বাবার কাছ থেকে থ্যালাসেমিয়া কীভাবে আসে?

জিন প্রাণের বংশগতির আণবিক একক। প্রাণী পলিপেপটাইড বা প্রোটিন গঠনের জন্য জিনের ওপর নির্ভর করে। ডাইঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ)-র একটি লম্বা শৃঙ্খল একটি জিন হিসাবে কাজ করতে পারে। এইরকম একটি জিন একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিশেষ আরএনএ তৈরি করে; এই আরএনএ সুনির্দিষ্ট একটি প্রোটিনের গঠন নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ জিনের ডিএনএ রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (আরএনএ) শৃঙ্খলের মাধ্যমে একটি পলিপেপটাইড গঠন করে। জিন, প্রজাতির তথ্যধারণ করে এবং প্রাণীর কোশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর মাধ্যমেই প্রজাতির গুণ অব্যাহত থাকে। সমস্ত জৈবিক বৈশিষ্ট্যধারণকারী প্রাণীর জিন আছে। জিন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ জেনেসিস থেকে যার অর্থ “জন্ম” বা জিনোস থেকে যার অর্থ “অঙ্গ”। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। অদরকারি, আপনাদের জন্য এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয়। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। শুধু জেনে রাখুন আমাদের শরীরে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, প্রতি কোশে। বিটা-র অবস্থান ১১ নম্বরে, আলফা-র ১৬ নম্বরে। “জিন” কাকুর বাড়ি ক্রোমোজোম। গণ্ডগোল যা পাকায়, এখানকার “জিন”-গুলোই। জিনের খপ্পরে পরলে জিনা হারাম হয়ে যায়। যত দোষ, জিনের ফোঁস।

আগেই বললাম, এটা জিন ঘটিত রোগ। অর্থাৎ কিনা মা-বাবার থেকেই আসে। অটোসোমাল রিসেসিভ, দু-জনেরই থাকতে হবে, দু-জনেই রোগের “বাহক” কিন্তু রোগী নয়। মোদ্দা কথা আপনাদের,

স্বাতীর মা এবং স্বাতীর বাবা, কাউকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই, অথচ দু-জনেই রোগ বহন করছেন। সুতরাং বিয়ের আগে ছোট্ট রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায় আপনি এ রোগের “বাহক” কি না। কোনো একজন “বাহক” হলে অসুবিধা নেই, চারটি বাচ্চার মধ্যে দু-টি বাচ্চা স্বাভাবিক হবে, বাকি দু-টি এই আপনাদের মতো “বাহক”। অর্থাৎ প্রতি প্রেগনেন্সিতে ৫০% সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা হবার আর ৫০% রোগের “বাহক” হবার।

কিন্তু দু-জনই “বাহক” হলে, তখন বিয়ে . . . উচিত বা অনুচিতের প্রশ্নে যাব না। আমি, আমার স্ত্রী, বিয়ের আগে প্রায় দশ বচ্ছর প্রেম করেছি। এমনকী বিয়ের আগে এই পরীক্ষাও করাইনি। যদি করাতাম, আর রিপোর্ট যদি দু-জনকেই ‘বাহক’ বলে দিত, তখন? উত্তর কী হবে? করতাম, করতাম, এবং অবশ্যই করতাম। বিয়ে। কিন্তু সন্তানাদি নৈব নৈব চ।

চারটি বাচ্চার মধ্যে একটির রোগ হবে, এই যেমন স্বাতীর আছে। দু-জন “বাহক” হবে আর এক জন সম্পূর্ণ সুস্থ। বলেই অরবিন্দবাবু, মানে স্বাতীর বাবার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ভুল হয়ে গেছে। একটা মস্ত ভুল। কারণ, ওনার মুখে একটা হাসি, আস্তে আস্তে চওড়া হবার জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং, ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামতে হল।

এটি ভাবার কোনো কারণ নেই, আপনার এক সন্তানের “রোগ” আছে মানে আগামী তিন জন, লাল দাগের ওপারে। এমন নয় যে আর “রুগী” বাচ্চা হবে না। না। ব্যাপারটি মোটেও এমন নয়। আমিই দেখেছি, একই মা-বাবার পর পর দুই সন্তান থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত। আর বইতে ছবি দেখেছি, তিনটি বাচ্চার, তিনটিই থ্যালাসেমিয়া “রুগী”। তাই বলা উচিত, প্রতি প্রেগনেন্সিতে ২৫% ক্ষেত্রে “রোগের” সম্ভাবনা, ৫০% ক্ষেত্রে “বাহক” হবে আর ২৫% ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুস্থ। ফুসসসস, ব্যস, মুখ আবার “এইটুক” হয়ে গেল।

“কিন্তু প্রেগনেন্ট অবস্থায় কি কোনোভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব?” সম্ভব। মায়ের পেটে বিশেষ জলের থলির মধ্যে বাচ্চা বড়ো হয়, সেই জল পরীক্ষা করে বোঝা সম্ভব। তবে অবশ্যই খরচ সাপেক্ষ।

একবার রোগ হয়ে গেলে কি কোনোভাবে সম্পূর্ণ সারে না? হ্যাঁ সারে। তবে আপনার আমার ঘরে না। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বলে এক ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে। যদিও ১০০% নয়। এইবার অরবিন্দবাবু বেশ উৎসাহিত হয়ে বললেন, “হ্যাঁ, জানি। কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের মতোই কি? আমার পাড়াতেই এক ভদ্রলোকের হয়েছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট।” না, এটি তার থেকেও আরও কঠিন পদ্ধতি। আপনারা যে আরেকটি সন্তান নেবার কথা ভাবছেন, সে জন্মাবার পর বা জন্মাবার আগেই, তার অস্থি মজ্জার থেকে বা নাড়ী থেকে বা দেহের রক্ত বা লিভার মানে যকৃৎ থেকে, কোশ নিয়ে, যাকে বলা হয় “স্টেম সেল”, সেটা নিয়ে স্বাতীর শরীরের অস্থি মজ্জায় পাচার করতে হবে। ইধার কা মাল উধার করতে হবে। সে ভয়ানক খটমট পদ্ধতি। খরচ দশ থেকে কুড়ি লাখ, মাত্র। জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়েছিলাম, বিষমের অপেক্ষায় ছিলাম। মায়ের পেটের ভেতর বাচ্চা থাকাকালীন অস্থিমজ্জার ট্রান্সপ্লান্ট বা জিন চিকিৎসার কথা শুনেছি, তবে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি নয়। এছাড়া ওর যে চিকিৎসা চলছে, সেই রক্ত দিয়ে যাওয়া; আর ‘চিলেশন’— মানে আয়রনকে বের করানোর চিকিৎসা।

“আচ্ছা, সবাই তো অ্যানিমিয়া হলে, আয়রন টনিক দেয়, তা আপনি খামোখা রক্ত বের করছেন কেন?”

হুম। ভালো বলেছেন। আয়রনের জমা হওয়াও একটা আয়রনি! স্বাতীর শরীরে যে রক্ত আছে এবং সেই রক্ত ভাঙে তাড়াতাড়ি, আগেই বলেছি। রক্তে আয়রন থাকে। ভেঙে যাওয়া রক্তের আয়রনগুলো জমা হচ্ছে ব্যাঙ্কে অর্থাৎ শরীরে। আবার দেখুন মাসে মাসে বাইরে থেকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। সেই রক্তও কালের নিয়মে ভাঙবে, আয়রন জমা হবে। কোথায়? ব্যাঙ্কে . . . শরীরে। এইটুক ছোটো ছোটো শরীরগুলো তো আর ষষ্ঠিচরণ না, যে লোহা নিয়ে লোফালুফি করবে। সুতরাং, সব জমবে শরীরে। এবং বেশি পরিমাণে জমবে।

একবার রোগ হয়ে গেলে কি কোনোভাবে সম্পূর্ণ সারে না? হ্যাঁ সারে। তবে আপনার আমার ঘরে না। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বলে এক ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে। যদিও ১০০% নয়।

জমা তো ভালো? তাতে ক্ষতি কী? কিন্তু সব জমা, ব্যাঙ্কের টাকা জমানো নয়। এই যে শরীরে মেদ জমছে, সেটা কি ভালো? উত্তর: না। জমা জলে মশা ডিম পাড়ে, তারপর ডেঙ্গু হয়, মানুষ মারা যায়। সেটা ভালো? উত্তর অবশ্যই না। তেমন, আয়রন জমাও ভালো না। শরীর তো আয়রনের বাবার সম্পত্তি নয়, যেখানে ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা জমবে। হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্নাশয়, পিটুইটারি, আরও অন্যান্য জায়গায়। হৃৎপিণ্ডে জমে এর কাজ বিকল হয়, ৭০% বাচ্চা মরে শুধুমাত্র এখানেই আয়রন জমে। বাকি যে সব জায়গায় জমে, ক্ষতি করে। ভীষণ ক্ষতি। তাই, স্বচ্ছ আয়রন অভিযান। এই আয়রন, বের করা হয় দু-ভাবে। চামড়ার তলায় ছুঁচ ফুটিয়ে বা ট্যাবলেট খেয়ে।

“আচ্ছা এই প্রতিবার রক্ত দেবার আগে এই অকারণে হিমোগ্লোবিনের টেস্ট করেন কেন? থ্যালাসেমিয়া আছে রক্ত তো দিতেই হবে।”

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে রক্ত দেওয়া হয়, তাকে “মডারেট

ট্রান্সফিউশন” বলে। এতে রক্ত দেবার আগে হিমোগ্লোবিনের ভ্যালু থাকার প্রয়োজন ৯-১০.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার। আগে অন্যান্য পদ্ধতিতে দেওয়া হত, যেমন প্যালিয়েটিভ,সুপার , হাইপার।

সব শেষে আসি নামের কথায়। রোগ আছে যখন, তখন তার নামও থাকবে, আর থাকবে একটা বিশাল ইতিহাস। এ রোগ নিয়ে যখন প্রথম বার আলোচনা করা হয়, তখন নাম দেওয়া কুলি'স অ্যানেমিয়া। না, বচ্চন সাহেবের “কুলি” দেখে না, সে গুড়ে বালি, সেটা ১৯৮২ সালের কথা। এ কথা আরও অনেক আগের কথা ১৯২৫ সালের কথা, থমাস বি কুলি (Thomas B Cooley) এবং পার্ল লি (Pearl Lee), এই নাম দিয়েছিলেন। থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) নামটি দেন হুপ্পল (Whipple) ও ব্রাডফোর্ট (Bradford), ১৯৩২ সালে, যদিও “মেডিটেরানিয়ান অ্যানেমিয়া” (Mediterranean anemia) নামেই সুপ্রচলিত ছিল। তা এত কিছু থাকতে “মেডিটেরানিয়ান অ্যানেমিয়া” কেন? কারণ গ্রিক ভাষায় “Thalassa” মানে সমুদ্র (sea) আর “-emia”-র অর্থ রক্ত সংক্রান্ত, ভাষান্তরে সমুদ্রের কাছের রক্ত সংক্রান্ত রোগ (anemia around sea), আর এই রোগের বাড়বাড়ন্ত এনারা এই অঞ্চলেই, মানে মেডিটেরানিয়ান দেশগুলোর আশেপাশেই লক্ষ করেন। পরে দেখা যায় শুধু এখানে না, সারা পৃথিবীতেই এনার অবস্থান। সংখ্যার কচকচানিতে বেশি না গিয়েও বলা যায়, সারা পৃথিবীতে প্রায় ৭% মানুষ “বাহক”, ভারতে ৩.৩% (১-১৭%)। ভারতে প্রতি বছর নয় থেকে দশ হাজার বাচ্চা জন্মায় এই রোগ নিয়ে, যেখানে একটি ছোট্ট রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ নির্মূল করা সম্ভব। হয় না। কেবল মাত্র অজ্ঞতার কারণে। ভারতে প্রথম বার এই রোগের সন্ধান পান এবং প্রকাশ করেন, ডা. এম মুখার্জি, এই কলকাতাতেই, ১৯৩৮ সালে। ব্যস শেষ, আর না। যা জানি বলা হয়ে গেছে। এবার উঠব।

“ডাক্তারবাবু একটা শেষ প্রশ্ন, অনেকক্ষণ ধরে মাথায় ঘুরছে।”

করে ফেলুন জলদি, আপনার মাথায় প্রশ্ন ঘুরছে, আর আমার মাথা।

“কী একটা কেটে ফেললে নাকি আর রক্ত দিতে হবে না? সেটা কী? তো প্রথমেই কাটছেন না কেন? খালি খালি বাচ্চাটাকে এত রক্ত নিতে হচ্ছে। গতবার বলছিলেন যে . . .”

মাথা।

অ্যাঁ।

হ্যাঁ। একমাত্র মাথা কাটলে আর রক্ত নিতে হবে না। এছাড়া হাত, পা, কান, সময় যাই কাটুন না কেন রক্ত নিতেই হবে। ফ্যালফ্যালে চোখে চেয়ে আছেন অরবিন্দ বাবু—

শুনুন, স্প্লিন বা প্লিহা কাটা হয়, যাকে বলা হয়, স্প্লেনেকটোমি। “হ্যাঁ, হ্যাঁ . . . ওইটাই বলেছিলেন, মনে পড়েছে।”

শুনুন, প্রতিবার যখন রক্ত দেওয়া হচ্ছে, সেটার একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, ১০-১৫ মিলিলিটার/কিলোগ্রাম, ব্যাস। মাসে একবার রক্ত নিলে বছরে বারো বা তেরো বার, অর্থাৎ ১২০-১৯৫ মিলিলিটার/কিলোগ্রাম/বছর হয়। যতদিন যায় ততই শরীরের রক্তের প্রয়োজন বাড়তে থাকে। এই যেমন আপনার টাকার পরিমাণ সংসারে বাড়ছে . . . কমছে কি? না। বাড়ছে। এও তাই, বাড়ে . . . কমে না। প্রথমদিকের চার-পাঁচ বা ছ-হপ্তাটা কমে পরের দিকে, দু-তিন হপ্তায় দাঁড়ায়, অর্থাৎ রক্তের পরিমাণটা বেড়ে ২২৫-২৫০ মিলিলিটার/কিলোগ্রাম/বছর-এ দাঁড়ায়। তখন স্প্লেনেকটোমির কথা ভাবতে হয়। আরও আছে, পাঁচ বছর বয়স না হলে করা যায় না। গোটা তিনেক ভ্যাকসিন দিতে হয়, সাবধানে থাকতে হয়, ইনফেকশনের ভয় থাকে, ওষুধ খেতে হয়, সারা জীবন। স্প্লেনেকটোমি করলে এই রক্তের প্রয়োজনীয়তা কমে, ১১০-১৩৫ মিলিলিটার/কিলোগ্রাম/বছর-এ দাঁড়ায়। তবে রক্ত লাগে না কথাটি সর্বৈব ভুল বা মিথ্যে। আর এই কারণেই ডাইরিটার দরকার। ডাইরিতে সব আছে। কবে ভর্তি হল, রক্ত দেবার আগে বা পরে কত হিমোগ্লোবিন ছিল, বছরে কতটা বা কতবার রক্ত পেল।

আর না। মাথা ঘুরছে। তার সাথে প্রবল খিদে। ক-টা বাজে খেয়াল আছে। আড়াইটা বাজতে চলল। রবিবার সুদ্ধু আপনার জন্য এখানে এসেছি।

করিডরে কয়েক পা হেঁটেই মনে হল পেনটা আনা হয়নি, ঘরেই পরে আছে। দরজার কাছে এসে শুনি, ভেতরে একটা গলার আওয়াজ, কেউ কথা বলছে, মোবাইলে

“. . . হ্যাঁ, বকবক অনেক করেছে, কিন্তু পরের বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া না হবার চান্সই বেশি। ভালো বোঝাতে পারেনি, জানে না হয়তো . . .”

পিছনমুখো হলাম, চরম অপ্রস্তুত হতে আর ইচ্ছা হল না। থাক পেন, দরকার নেই, পে(হ)ন তো আছে সঙ্গেই।

পুনশ্চ: এর ঠিক ছ-মাস পর স্বাতীর একটি ফুটফুটে ভাই হয়, অভিরূপ। অর্থাৎ আমি যখন, পণ্ডশ্রম করছি, ততক্ষণে “স্বাতীর মা” “অভিরূপের মা” হবার দিকে গুটি গুটি পায়ে হাঁটা শুরু করে দিয়েছেন! সেও তিন বছর পার হয়ে গেছে, কাল অভিরূপ এসেছিল, বাবা, মা, দিদির সাথে। জ্বর হয়েছে তাই। ওর থ্যালাসেমিয়া হয়নি। কপাল! সবই কপাল!

পুনশ্চের পর: ওহ্ . . . স্বাতীর স্প্লেনেকটমি হয়ে গেছে। ভালোই আছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. প্রলয় বসু, এমবিবিএস, ডিএনবি (পেডিয়াট্রিক্স), প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

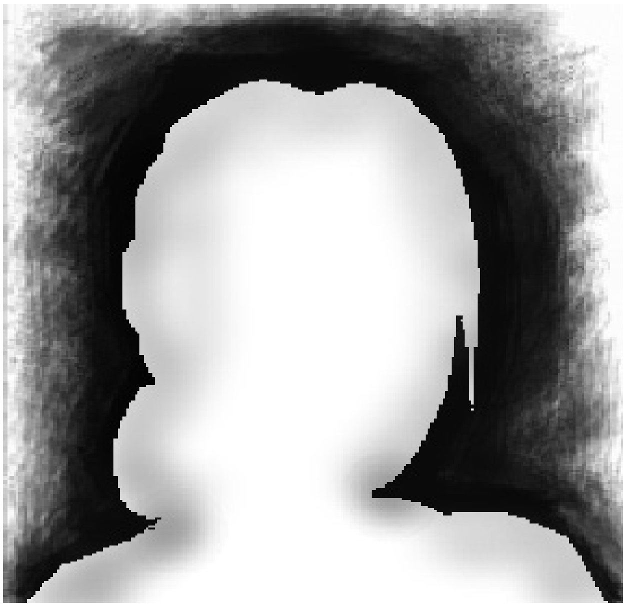

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

১২ মে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

ব্যাপারটা কিন্তু শুরুর দিকটায়, এরকমটা ছিল না মোটেই। অন্তত, আড়াই হাজার বছর আগে তো নয়ই।

এ বিষয়ে ইতিহাস-লব্ধ সূচনাটাই আসলে বেজায় রকমের গোলমেলে। পরিষ্কারভাবে কোথাও কোনো তথ্যই নেই। তবুও এদিক খামচে সেদিক খুমচে যেটুকু জানা যায়, তাতে মোটামুটিভাবে এটা বলাই যেতে পারে যে, এক্ষেত্রে প্রথম দিকে, "এটি" সেই অর্থে "জীবিকা" হিসাবে পরিগণিত হত না।

খুলে বলি। যিশুর জন্মেরও বছর পাঁচশো আগে, হিপোক্রেটিস-এর লেখা বইতে, প্রথমবারের জন্য এমন কিছু মানুষের উল্লেখ পাওয়া গেল, যাঁরা মুমূর্ষুকে সেবাদান করবার পাশাপাশি, অল্পবিস্তর প্রাথমিক চিকিৎসাও করতেন। খুব সম্ভবত, এঁরাই হলেন বর্তমান "নার্স"-দের প্রথম পুরুষ। পুরুষ মানে কিন্তু "পুরুষ"-ই। কারণ তখন, এই সেবাদানের কাজটুকু করতেন ব্যাটাছেলেরা। আর এইভাবেই চলে আসছিল।

পরিবর্তনটা ঘটল আরও বহু বছর বাদে। ধর্মের হাত ধরে। ক্রিশ্চিয়ান হোক কি ইসলাম, অথবা অন্য যেকোনো ধর্ম, সব ক-টিরই প্রধান এবং অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল "অন্ধ আতুর দীন জনে" সেবা প্রদান করা। আর তাই থেকেই হইহই করে শুরু হল, অরগানাইজড নার্সিং-এর।

ক্রিশ্চিয়ান অ্যাবি-গুলিতে যে সব নারীরা, "নান" হিসাবে থাকতেন, তাঁরা দলবদ্ধভাবে, নাগাড়ে সেবা করে যেতেন দুঃস্থ রোগীদের। নিয়ম মেনে প্রসবে সাহায্য করতেন জননীদের। আমরা, চলতি কথায়, নার্সদের যে, "সিস্টার" বলে ডাকি, তার উৎসস্থল কিন্তু এই ক্রিশ্চিয়ান ধর্মই।

ইসলামও অবশ্য পিছিয়ে ছিল না। বস্তুত ইতিহাসে, সর্বপ্রথম রচিত "কোড অফ নার্সিং এথিকস", একজন মুসলমান "নার্স"-এর হাত ধরেই। নাম তাঁর রুফাইদা। মেদিনার যে কয়জন মানুষ সবার আগে ইসলাম ধর্মকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে ছিলেন, রুফাইদা তাঁদেরই মধ্যে একজন। পিতা চিকিৎসক হওয়ায়, সেবাশুশ্রূষা সম্পর্কিত প্রাথমিক পাঠটুকু জানা ছিল তাঁর। আর তাই, মহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীরা যখন যুদ্ধে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে চললেন রুফাইদা এবং তাঁর সহকারী সেবিকারা। পরবর্তীতে, খোদ "হজরত পাক"-এর ইচ্ছানুসারে, মেদিনা মসজিদের ঠিক পাশটিতে একটি আস্তানা গড়ে তোলা হল। এখানে দুঃস্থ আতুরকে সুস্থ করে তোলার পাশাপাশি চলত আরও আরও নতুন সেবিকা তৈয়ারির ট্রেনিং। আস্তানার "হেড" বলাই বাহুল্য—রুফাইদা-ই।

আর অজন্তার গুহাচিত্রের বৌদ্ধ "নার্স"-এর ছবি তো বিশ্ববিখ্যাত।

চলছিল মোটামুটি এইভাবেই। খুঁড়িয়ে খাঁড়িয়ে। নার্সিং তখনও অবধি কোনো "জীবিকা" নয়। নার্সিং তখনও অবধি স্রেফ—"শ্রমদান"। তারপর অবস্থা খানিক পালটাল। পালটাল, ক্রিশ্চিয়ান শাসিত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে। ষোড়শ শতাব্দীতে, বেশিরভাগ, মনাস্ট্রিই বন্ধ

খুব সম্ভবত, এঁরাই হলেন বর্তমান "নার্স"-দের প্রথম পুরুষ। পুরুষ মানে কিন্তু "পুরুষ"-ই। কারণ তখন, এই সেবাদানের কাজটুকু করতেন ব্যাটাছেলেরা। আর এইভাবেই চলে আসছিল।

হয়ে গেল হঠাৎ। দেশজুড়ে তখন প্রোটেস্ট্যান্টদের রমরমা। অধিকাংশ নান-ই সংসার ধর্মে ফিরে গেলেন বাধ্য হয়ে। এবং এক ঝটকায়, চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে লোপাট হল—শিক্ষিত সেবিকা গোষ্ঠী। লোপাট হল তো হলই। এরপরের প্রায় দু-শো বছর ধরে, চিত্রটা খুব একটা পালটায়নি।

নার্সিং ব্যবস্থাকে, ফের যিনি সংগঠিত করলেন, তাঁর নাম ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল। ভদ্রমহিলা জাতে ব্রিটিশ। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময়, ফ্লোরেন্স

যখন সেবিকা হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করছেন, তখনও নার্সদের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। ছিল না কোনো বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। নাইটিঙ্গল এই বিষয়টাতেই পরিবর্তন আনলেন গোড়া থেকে। সেন্ট থমাস হাসপাতালের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে গড়ে তুললেন প্রথম "স্কুল অফ নার্সিং"। শুরু হল, প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে, "সংগঠিত নার্সিং"-এর জয়যাত্রা।

মুসলমান শাসিত দেশগুলিতে অবশ্য এ-ব্যবস্থা সেই রুফাইদা-র আমল থেকেই। ক্রমে এই ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দুনিয়ায়। আর সেইখান থেকে একটু একটু করে আরও সংগঠিত হতে হতে তৈরি হল এ যুগের সবথেকে সম্মানীয় এবং সবচাইতে কঠিন একটি জীবিকা। "নার্সিং"।

নীলুদির বিয়ে হয়নি। নীলুদি, একদিন সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

তা, হঠাৎ করে আজকে কেন বলছি এসব গম্ভীর গম্ভীর কথা? কারণ সমানেই ১২ মে। "ওয়ার্ল্ড নার্সিং ডে"। মে মাসের এই বারো তারিখেই যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল জন্মেছিলেন।

"হাগ-ডে", "কিস-ডে", "রোজ-ডে", এসব চপশিল্পের ঢপ অনেক তো হল। এবার না হয় এসব বকওয়াস ছেড়ে, আগামীকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে "নার্সিং-ডে" পালন করুন।

জানেনই তো, আমি নিজে, পেশায় চিকিৎসক। আর তাই বুক বাজিয়ে, গলা তুলে বলছি—

"বিশ্বাস করুন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সবচাইতে বড়ো অংশ হলেন এই নার্সিং স্টাফরা।"

আমরা ডাক্তাররা, রোগী দেখি, ওষুধ লিখি, তারপর কেটে পড়ি হাসপাতাল থেকে। কিন্তু সেই ওষুধ সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন যাঁরা, রোগীর হাগু মুতু কফ মোছেন যাঁরা, রক্ত টেনে পরীক্ষায় পাঠান যাঁরা, এবং মিনিটে মিনিটে রুগীর স্যালাইনের স্পিড অ্যাডজাস্ট করেন যাঁরা, তাঁরা হলেন নার্স।

বিগত পনেরো বছরে আমি বহু হাসপাতাল আর নার্সিংহোমে কাজ করেছি। ভীষণ কাছ থেকে দেখেছি, কী প্রচণ্ড রকমের আসুরিক চাপের মধ্যে কাজ করতে হয় "দিদি"-দের।

বেয়াড়া রুগী, জলদি সুস্থ হওয়ার লোভে স্যালাইনের স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছে . . .

উদ্‌বিগ্ন আত্মীয়-পরিজন এসে বারে বারে "মাসি, এই টেস্ট-টা কাল কখন হবে" করে জ্বালিয়ে মারছে . . .।

কলার-তোলা দাদা এসে, "সিস্টারগুলো শালা চেয়ারে বসে বসে সারাদিন শুধু ছেঁ . . . " বলে, টেবিল চাপড়াচ্ছে . . .।

তবুও এঁরা দায়িত্বে অবিচল। অতন্দ্র।

আমায় দেখতে অনেকটা "ভাই ভাই" মার্কা। তাই সব দিদিদের সাথেই আমার অম্লমধুর সম্পর্ক। একবার তাই সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এক সিস্টারকে—"দিদি, আপনারা সব সময় এত চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে কথা বলেন কেন বলুন তো?"

দিদি হেসেছিলেন। আমি তখন তাঁরই বাড়ি থেকে নিয়ে আসা টিফিনে ভাগ বসিয়ে, "লইট্যা ঝাল" খাচ্ছিলাম ভাতে মেখে। হাসতে হাসতে দিদি বলেছিলেন, "ডা. সেনগুপ্ত, একটা দিন আমার চেয়ারে বসে সত্তরটা পেশেন্ট একসাথে কনট্রোল করুন . . . বুঝে যাবেন।" আমি, চুপ করে গিয়েছিলাম।

"হাগ-ডে", "কিস-ডে", "রোজ-ডে", এসব চপশিল্পের ঢপ অনেক তো হল। এবার না হয় এসব বকওয়াস ছেড়ে, আগামীকাল কৃতজ্ঞ চিত্তে "নার্সিং-ডে" পালন করুন।

দিদির নাম ছিল নীলুদি। আমি তখন দক্ষিণ কলকাতার এক বিখ্যাত নার্সিংহোমের "আই. সি. ইউ" মেডিক্যাল অফিসার। নীলুদির সাথে আলাপ সেখানেই। মোটাসোটা এক মহিলা। মুখ ভর্তি ব্রণ। বলতেন, "আমার দাগগুলো সারিয়ে দেবেন ভাই? হলদিয়ার সম্বন্ধটাও ক্যানসেল হয়ে গেল . . . আর পারছি না . . . সারাদিন রোগীর বাড়ির লোক কুকুরের মতো গালমন্দ করে . . .।"

নীলুদির বিয়ে হয়নি। নীলুদি, একদিন সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

সামনেই তো নার্সিং-ডে। আসুন না, প্লিজ, যাঁরা যাঁরা এ লেখা পড়ছেন, তাঁরা সক্কলে মিলে একটা প্রমিস করি। এরপর যখনই কোনো নার্সের সংস্পর্শে আসব, একবারের জন্য হলেও তাঁকে "থ্যাঙ্ক ইউ সিস্টার" বলব।

বিশ্বাস করুন, এখনও অবধি, তবু কিছুমিছু মানুষ হাত কচলিয়ে বলেন, "কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাই ডাক্তার বাবুউউ . . .। "

কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনিনি, "থ্যাঙ্ক ইউ দিদিইইইই"।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

ডাক্তার দিদির গল্প

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক

আজ আমি এক ডাক্তার দিদির গল্প শোনাব। ডা. পারমিতা মুৎসুদ্দি।

আমার প্রথম পোস্টিং খড়গ্রাম হাসপাতালে যোগ দেওয়ার থেকেই শুনে যাচ্ছিলাম এখানে একজন মহিলা ডাক্তার আছেন। যিনি বর্তমানে মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন।

হাসপাতালে তখন চরম অবস্থা। আছি দু-জন মেডিক্যাল অফিসার। আমি আর ডা. সঞ্জীব রায়। আরেকজন অবশ্য ছিলেন। আমাদের বিএমওএইচ ম্যাডাম। কিন্তু তিনি অনেকটা গেছোদাদার মতো। কোথায় যে কখন থাকতেন বলা ভারি শক্ত। অত কঠিন অঙ্ক করতে পারলে কি আর ডাক্তারি পড়ি!

আমরা দু-জন চিকিৎসক মিলে খড়গ্রাম ব্লকের সাড়ে তিনলক্ষ মানুষের ষাট বেডের একমাত্র হাসপাতালটি চালাতে গিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছিলাম। এর উপর আবার সঞ্জীবদা সকাল, সন্ধ্যে প্র্যাকটিস করত। ফলে আমি কথা বলার একজন লোকও পাচ্ছিলাম না।

এ সময় আমার সবচেয়ে ভালোলাগার কাজ ছিল সন্ধ্যে নামার সাথে সাথে কোয়ার্টারের দরজা জানলা বন্ধ করে খিস্তি দেওয়া। সবচেয়ে বেশি খিস্তাতাম নিজেকে। এই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে চাকরি করতে আসার জন্য। তারপরই কোনো রোগী বা রোগীর বাড়ির লোকের উপর রাগ হলে তাকে। এবং তখনও অপরিচিত ডা. পারমিতা মুৎসুদ্দিও আমার খিস্তির হাত থেকে রক্ষা পেত না। মনে মনে বলতুম, “শালা, এখানে আমাদের দু-জনের ফাটছে, আর একজন ঘরে বসে টাকা গুনছে।”

এইভাবে একনাগাড়ে খিস্তি করার পর আমার মনের হতাশা কিছুটা হলেও কেটে যেত। আমি আবার একটি সুদীর্ঘ নাইট ডিউটি করার মনোবল অর্জন করতাম।

এই দুরবস্থা কিছুটা কাটল পীযূষদা আমাদের হাসপাতালে আসার পর। এবং সুদীর্ঘ দুই মাস পরে আমি তিনদিনের জন্য বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পেলাম।

পীযূষদার খড়গ্রাম হাসপাতালে প্রথম পদার্পণ রীতিমতো ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই গল্প পরে শোনানো যাবে। আজ পারমিতাদির গল্প বলি।

পীযূষদা হাসপাতালে যোগ দেওয়ার পর আমার খিস্তির রুটিনের বিশেষ পরিবর্তন হল না। আগে একজন মিলে খিস্তাতাম, এখন একসাথে দু-জন। পীযূষদার মতো এমন সৎ নারীবিদ্বেষী সহকর্মী পাওয়া ভাগ্যের ব্যপার। দু-জনে একটা বিষয়ে একশো শতাংশ সহমত ছিলাম যে ডা. পারমিতা মুৎসুদ্দি একজন অত্যন্ত ফাঁকিবাজ মহিলা চিকিৎসক। তিনি যদি সত্যি সত্যিই আদর্শ চিকিৎসক হতেন তাহলে মাতৃত্বকালীন ছুটি না নিয়ে হাসপাতালে ডিউটি করতেন।

পারমিতাদি যেদিন দু-টি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে টলমল করতে করতে একাই তার কোয়ার্টারের ঢুকল, কোয়ার্টারের তালা খুলতেই তার পনেরো মিনিট লাগল, সেদিন একটু থমকে গেছিলাম। ওই ছোটোখাটো চেহারার মহিলা, পারবে দুটো বাচ্চাকে সামলে চব্বিশ ঘণ্টার-আটচল্লিশ ঘণ্টার ম্যারাথন ডিউটি করতে। তার মধ্যে একজন আবার দুধের শিশু। অন্যটি শিশুটি যে কী চিজ কেউ না বুঝলেও আমি পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

আমি আর পীযূষদা একটা বিষয়ে একমত হলাম, দু-চার দিন ডিউটি করার পরই ওই মহিলা ‘ই এল’ অথবা মেডিক্যাল কিছু একটা ছুটি নিয়ে পালাবে। অতএব নারী জাতির উপর আমাদের বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেল এবং আমাদের খিস্তির পরিমাণও সমানুপাতে বেড়ে গেল। আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে মেয়েদের ডাক্তারি পড়ানো পুরোটাই সরকারি অর্থের অপচয়।

কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই মহিলা একা একাই লড়ে যেতে শুরু করল। বৃদ্ধা এক মাসির কাছে দু-টি বাচ্চাকে রেখে একবার হাসপাতাল আর একবার কোয়ার্টারের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ডিউটি করে যেতে লাগল। একবারও আমাদের কাউকে বলল না, ঘণ্টাখানেক ডিউটিটা একটু দেখে দেওয়ার জন্য।

যা ভাবা হয়েছিল, তা না হওয়ায় আমরা একটু হতাশই হয়ে পড়লাম। একদিন আগ বাড়িয়ে বলতে গেলাম, “দিদি তোমার কোনো সাহায্য লাগলে বোলো।”

পারমিতাদি একগাল হেসে বলল, “তোদের অনেক জ্বালিয়েছি। আমার ছুটি নেওয়ার জন্য তোদের অতিরিক্ত ডিউটি করতে হয়েছে। তোদের কোনো সাহায্য লাগলে বলিস।”

তা সাহায্য আমি কম নিইনি। ডিউটি করতে করতে বোর হয়ে গিয়ে পারমিতাদিকে বলেছি, “আধ ঘণ্টা একটু দেখে দাও না। ক্যানেলের পারে সূর্যাস্ত দেখে আসি।”

তারপর আধ ঘণ্টার নাম করে কান্দিতে ডা. সঞ্জয় গুপ্তের ঘরে আড্ডা মেরে তিন ঘণ্টা পর ফিরে এসেছি। ফিরে দেখেছি পারমিতাদি একসাথে বারোটা ইনজুরি রোগী নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইনি। কারণ ততদিনে পারমিতাদি আমার সত্যিকারের দিদি হয়ে উঠেছে। আর দিদি যদি ভাইদের জন্য এটুকু না করে, তাহলে জগৎ টিকে থাকবে কী করে?

পারমিতাদির বড়ো ছেলে গুগুল কিন্তু মায়ের মতো অতটা সাদাসিধা ছিল না। পারমিতাদি দুপুর বেলায় কোয়ার্টারে থেকেই ডিউটি করত। যেসব রোগী খুব খারাপ নয় তারা ইমার্জেন্সি থেকে টিকিট করে কোয়ার্টারে এসে পারমিতাদিকে দেখিয়ে যেত। গুগুল বারান্দায় তক্কে তক্কে থাকত। পেশেন্ট কোয়ার্টারের সামনে আসলেই সে বলত, "মা তো ঘরে নেই। তোমারা ওখানে ঐন্দ্রিল মামাকে গিয়ে দেখাও।" বলে তার ছোট্ট হাত তুলে আমার কোয়ার্টারটা দেখিয়ে দিত।

পারমিতাদির ডিউটি সব সময় খারাপ যেত। হাসপাতাল সুদ্ধু আমরা সবাই পোস্ট গ্র্যাজুয়েশানের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে এসেছি, দিদি একাই ডিউটি করছে। বলা-কওয়া নেই, খড়গ্রামের মোড়ের নয়ানজুলিতে ভোর ছ-টার তারাপিঠের বাস উলটে গেল। একসাথে ষাট-পঁয়ষট্টি জন আহত রোগী। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত। কোনো ঝামেলা ছাড়াই পারমিতাদি একা পুরোটা সামলে ছিল।

নিঃসন্দেহে আমাদের সব মেডিক্যাল অফিসারদের মধ্যে পারমিতাদির সাহস ছিল সবচেয়ে বেশি। কেউ অন্যায় সুযোগ নিতে চাইলে, সে স্থানীয় এমপি, এমএলএ বা রাজনৈতিক দলের মস্তান যেই হোক, সুবিধা করতে পারত না। বরঞ্চ অনেক সময় রণং দেহি দিদিকে আমরা গিয়ে সামলেছি। পালস পোলিয়োতে পারমিতাদির সাথে সদলে গিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকার সময় বুঝেছি আমি আসলে অত্যন্ত ভীতু একজন মানুষ।

আর বেশি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। শেষ করার আগে একটা গল্প শোনাই।

একদিন ডিউটির মধ্যে এক অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত নানা বয়সের পুরুষ রোগী আসতে শুরু করল। মানুষগুলির বক্তব্য একই। তাদের ইয়ে . . . মানে মূল যন্ত্রটা আরকি . . . আস্তে আস্তে শরীরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কয়েকজন আসছে অত্যন্ত আপত্তিজনক ভঙ্গিতে। এক হাত লুঙ্গি বা প্যান্টের মধ্যে ঢুকিয়ে যন্ত্রটাকে শক্ত করে চেপে ধরে রয়েছে।

'কোরো' রোগের কথা বইয়ে পড়েছি। এটা একধরনের 'মাস হিস্টিরিয়া', যে রোগে এলাকার বহু মানুষ একসাথে আক্রান্ত হয়।

সাইক্রিয়াট্রি বইতে পড়েছিলাম। কিন্তু নিজে যে কোনো দিন সেই মাস হিস্টিরিয়ার সম্মুখীন হব স্বপ্নেও ভাবিনি।

অবশ্য এর পরে আরও একটা গণ হিস্টিরিয়ার সম্মুখীন হয়েছিলাম এই খড়গ্রামেই। সেটা ছিল মেহেন্দি কাণ্ড। আক্রান্তরা ছিল কমবয়সি মেয়ে এবং ব্যাপকতা ছিল অনেক বেশি। সে গল্প অন্য একদিন শোনাব।

'কোরো' অসুখেই ফেরত আসি। ওয়ার্ডে রোগীতে ছয়লাপ। অসুখের ভয়ে লোকজন লাজলজ্জা ভুলেছে। জামা কাপড়ের ঠিক নেই। নার্স দিদিরা কোনোমতে অন্যদিকে তাকিয়ে স্যালাইন চালাচ্ছে। তাদের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। রোগীদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না।

সেদিনের রাত্রি 'কোরো'-র কল্যাণে নির্ঘুম কাটল। সারা রাত্রি রোগী এসেছে। কারও কপালে চন্দনের ফোঁটা, কারও আবার সারা গায়ে চুন লেপা। 'কোরো' রোগের ওষুধ। সকাল সাতটায় ডিউটি পরিবর্তন। ভাবলাম আউটডোরের আগে ঘণ্টাখানেক অন্তত ঘুমিয়েনি। সবে শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা।

দেখি পারমিতাদি। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। আমাকে দেখে বলল, "অসম্ভব, আমি ডিউটি করতে পারব না। যত সব অশিক্ষিত, আনকালচার্ড লোকজন। তুই আজকের দিনটা টেনে দে।"

"পারমিতাদি, আমি কাল রাতে একটুও ঘুমাইনি। আমি আর পারব না।"

"আমিও পারব না। ছি ছি, তুই বল আমার পক্ষে ওই সব পেশেন্ট দেখা সম্ভব। প্লিজ ভাই, অন্তত ওই পার্ভার্টেড লোকগুলোকে তুই দেখ।"

অগত্যা আবার ইমার্জেন্সিতে গেলাম। সেখানে ভালোই ভিড় জমেছে। বেশিরভাগেরই একই সমস্যা। সমস্যার কথা শুনতে শুনতে আমি ঘুমে ঢুলছিলাম।

ঘুমাতে ঘুমাতেই রোগী দেখছিলাম। হঠাৎ পিঠে কে হাত দিল। তাকিয়ে দেখি পারমিতাদি।

দিদি বলল, "যা ঘুমিয়ে নে। আমি ডিউটি করছি। ডাক্তারি যখন পড়েছি তখন . . . বলো বাবা, তোমার কী হল . . . "

পারমিতাদির লেকচার শুনতে পাচ্ছিলাম, "এরকম অসুখ হতে পারে না। বিশ্বাস না হলে স্কেল দিয়ে মেপে দেখ। এখন মাপবে, আবার এক ঘণ্টা পরে মাপবে . . . দেখবে একই আছে।"

চিকিৎসক জীবনের শুরুতেই আমি পারমিতাদিকে দেখেছি, পীযূষদাকে দেখেছি, চিরঞ্জীবদাকে দেখেছি, সঞ্জয়দাকে দেখেছি। এদের রোগীর প্রতি অসামান্য কর্তব্যবোধ দেখেছি। এদের অসাধারণ মেধা দেখে অবাক হয়েছি। এদের উচ্চ চিন্তাভাবনা নিয়ে মাটির কাছাকাছি থাকার বাসনা অনুভব করেছি।

তাই এর একটাও গুণ না থাকা মানুষেরা যখন চিকিৎসকদের গালিগালাজ করেন, তখন বড্ড রাগ হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

পর্ব উনিশ

'ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে' পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এরমধ্যে ডিসেম্বর ২০১৮-য় সাহিত্য সংসদ ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করে। পর্ব আঠেরো থেকে ওই গ্রন্থটি থেকে পুনর্মুদ্রণ আকারে স্বাস্থ্যের বৃত্তে ধারাবাহিকটি চলতে থাকবে—শেষ না হওয়া পর্যন্ত। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে জীবনকথা-র অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

নলিনীর যাওয়ার সময় হয়ে এল। সে ফিরছে শ্বশুরবাড়ি। সেজন্যে ধামা ধামা মুড়ি, কলসি কলসি গুড় আর নারকেল পাতার কাঠি (ঝাঁটার কাঠি) ও পাটকাঠিতে নৌকো বোঝাই করে দেওয়া হল। এত বেশি বেশি দেওয়া হয়েছিল যে গুণে শেষ করা যায় না। নলিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসছে—বিদায় নিতে। বাড়ির আর সকলে তার সঙ্গে সঙ্গে। সবার চোখে জল। যখন বাড়িতে আর একজনও রইল না, একটা মেটে-কলসি কাঁখে নিয়ে আমি বিলের ধারে ঘাটে গেলাম—যেন জল আনতে যাচ্ছি। মাঝি দুটোকে বললাম: 'তোমরা যাও, বাকি মালপত্তর আর কাচ্চাবাচ্চাগুলোকে নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ এদিকটায় আছি, নজর রাখছি।' ওরা যেতেই আমি নৌকোয় চড়ে বসলাম। ছাউনির

ভেতর ঢুকে নারকেল-কাঠি আর পাঠকাঠির আঁটিগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

একটু পরেই মাঝিরা, নলিনী আর গাঁয়ের মেয়েরা ঘাটপাড়ে চলে এল। যাত্রীরা নৌকোয় চড়ে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। মেয়ে-বউরা সমস্বরে 'দুর্গা দুর্গা' নাম জপতে লাগল। এই হই-হট্টগোল ডামা-ডোলের মাঝে কেউ আমার খোঁজ করেনি, আমিও মুখে কুলুপ এঁটেই ছিলাম। নৌকোর দড়িদড়া খুলে ফেলা হল, আদিত্যবাবু তাঁর বাচ্চা-দের গালে চুমু দিয়ে বিদায় জানালেন। নলিনী আমি উঠেছি কিনা খোঁজ করছিল। খানিক পরে বলে উঠল: 'মনে হয়, ও আর পেরে ওঠেনি, আর আসবেই-বা কী করে! ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে এত হ্যাপা আর সামলাতে পারি না বাপু! ও

আসতে পারলে আমার কতটা সুসার হত, বলো তো! কিন্তু ঠাকুমার সেই এক গোঁ—কিছুতেই ওকে কোথাও যেতে দেবেন না। একটা কথা তুমি আমায় বলো তো বাপু!—তোমার কেউ না অথচ তার ওপর জোর করে খবরদারি চাপিয়ে দাও কোন মুখে শুনি! ওর যেখানে খুশি ও যেতেই পারে। ও তোমার মেয়েও না, ছেলের বউও না—তাহলে ওর চলাফেরায় এত বাধানিষেধই-বা কেন?

ওরা দু-জনে অনেকক্ষণ ধরেই টুকটাক এইসব কথাবার্তা চালাচ্ছিল। সন্ধে গড়িয়ে এল, আমি একবার নড়েচড়ে উঠলাম। শুকনো পাটকাঠি থেকে মড় মড় আওয়াজ বেরিয়ে এল। আদিত্যবাবু ইতি-উতি চাইতে লাগলেন—শব্দটা আসছে কোথা থেকে?

‘কিন্তু ঠাকমা আমাকে কোনোদিন একটুও বকাঝকা করেননি।’ নলিনী টিপ্পনি কাটল: ‘করেননি বুঝি! থাকো-না কিছুদিন ওর সঙ্গে! টেরটি পাবে, কোন ধাতুতে গড়া জীব উনি!’

বাচ্চাগুলোর ঘুমের সময় হয়ে এল। ওরা চিঁড়ে, মুড়কি আর দুধ নিয়ে এল। তিনি জিগেস করলেন: ‘কতজনের জন্যে চিঁড়ে ভেজাব?’ নলিনী মাথা গুনে তাকে বলে দিল। এই সময়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: ‘আর আমি? আমি বাদ!’ নলিনী বলে উঠল: ‘হা ভগবান! ও তো দেখি চলে এসেছে! এতক্ষণ ছিলে কোথায় তুমি?’ আদিত্যবাবু বলল: ‘কী সব্বোনাশ! এ যে দেখছি তোমার বোনদি-র পেতনি!’ নলিনী বলল: ‘তাই নাকি? ও পেতনি হোক বা না হোক, তাতে আমার কিচ্ছুটি যায়-আসে না। কিন্তু ও ওখান থেকে বেরিয়েই-বা আসছে না কেন?

আমি ধীরে ধীরে উঠে এলাম। আদিত্যবাবু বলল: ‘বাব্‌বা বোন! একশোবার মানি, তুমি একটি ঝুনো চোর-বেদেনি।’ জবাব দিলাম: ‘যাদের সঙ্গে থাকছি, তাদের মতো করেই তো আমাকে চলতে হয়। তোমার সঙ্গে এসেছি ভাই—এখন তুমি যা যা করবে, তার সব কালির ছোপ তো আমার গায়েও লাগবে।’ মনে হল ওরা সকলে বেশ খুশি। নলিনী বলল: ‘মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমি ওর জামাকাপড় সব নিয়ে এলাম অথচ ও-ই আসতে পারল না। না-জানি কত গঞ্জনা ওকে গিলতে হচ্ছে ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না।’ বললাম: ‘কিন্তু ঠাকমা আমাকে কোনোদিন একটুও বকাঝকা করেননি।’ নলিনী টিপ্পনি কাটল: ‘করেননি বুঝি! থাকো-না কিছুদিন ওর সঙ্গে! টেরটি পাবে, কোন ধাতুতে গড়া জীব উনি!’ এরপর আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে তাস খেলতে বসে গেলাম। তাস খেলা নলিনীর এক বিরাট নেশা।

বিল পেরিয়ে আমরা গিয়ে পড়লাম বড়ো নদীতে। মাঝিরা আমাদের বিছানা-লেপ-তোশক-বালিশ আর অন্যান্য মালপত্তর বয়ে নিয়ে এসেছিল। বড়ো নৌকোটায় বিছানা পাতা হল। আমরা তাতে শুয়ে পড়লাম। গোটা রাতটা আমরা বড়ো নদীর ওপরেই ছিলাম। সকালে আদিত্যবাবু এক চুপড়ি ভর্তি মাছ কিনলেন। খানিক পরেই ঢাকা-র একপ্রান্তে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আমরা নৌকো ভেড়ালাম।

ঘোড়ার গাড়ি এল। তাতে চড়ে গান্ডারিয়ায় ওদের বাড়িতে উঠলাম। এই গাঁ-টা দেখলাম একদম নতুন ধরনের—এখনও লোকজন আসছে আর নতুন নতুন বসত গড়ে তুলছে। সার সার খোড়ো-বাড়ি, মাথায় টিনের চাল, বাড়িগুলো সব গা-ঘেঁষাঘেঁষি। বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে এত আনন্দ হচ্ছিল, ভাবছিলাম এক পাক ঘুরে আসি, দেখে আসি নতুন-গাঁয়ের ঘরবাড়ি। কিন্তু না, বাচ্চাগুলোর কাল থেকে পেটে ভাত পড়েনি। আমি ঝটপট চুলোয় একটা পেতলের হাঁড়িতে ভাত চড়িয়ে দিলাম, আর একটা চুলোয় দুধ-জ্বাল বসালাম। নলিনী বাচ্চাগুলোকে গেলাসে গেলাসে দুধ দিল; আমি বসে গেলাম মাছ কেটেকুটে ধুয়ে সাফ করতে। নলিনী মাছের ঝোল রাঁধল, সঙ্গে কয়েকটা মাছও ভাজল। আমি বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে দিলাম। বেলা এগারোটার মধ্যেই ঘরকন্নার কাজ সব সারা। তারপর বেরোলাম পাড়া ঘুরতে।

প্রথম গেলাম রামকুমারবাবুর বাড়ি। সে-বাড়ির গিন্নির তখনও রান্নাবান্না সারা হয়নি। তিনি দিনে একবারই রাঁধেন আর বিকেলে বানান রুটি বা লুচি। অনেকটাই বয়েস হয়েছে তাঁর; গেরস্থালির রোজের ভারী ভারী কাজের ধকল আর তেমন নিতে পারেন না। একটি উড়িয়া চাকর তাঁর সব কাজ করে দেয়। গিন্নি শুধু আনাজপাতি কাটেন আর মশলা বাটেন। সকালে তাঁর নিত্য পুজো সারতে অনেকটাই বেলা হয়ে যায়। আমি গিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললাম: ‘আপনার দু-একটা কাজে আমি হাত লাগাই না?’ তাঁর জবাবে একটা দ্বিধা, একটা আড়ষ্ট ভাব ছিল। কেউ তার মানে করতে পারে ‘হ্যাঁ’, আবার কেউ-বা ‘না’। আমি ‘হ্যাঁ’ ধরে নিয়ে তাঁর বাটনা বেটে দিলাম। ফলে তিনি চটপট রান্না সেরে তাঁর কর্তাকে ভাত বেড়ে দিতে পারলেন। নলিনী

এই গাঁ-টা দেখলাম একদম নতুন ধরনের—এখনও লোকজন আসছে আর নতুন নতুন বসত গড়ে তুলছে। . . . বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে এত আনন্দ হচ্ছিল, ভাবছিলাম এক পাক ঘুরে আসি, দেখে আসি নতুন-গাঁয়ের ঘরবাড়ি।

চলে গেল কিন্তু আমি রয়ে গেলাম। বাড়ির কর্তা জিগেস করলেন: 'মেয়েটি কে? কার বউ?' তিনি জবাব দিলেন: 'ও আমাদের পড়শি-বাড়ির একটি মেয়ে। বেচারা! হাতে হাতে আমার কত কাজ করে দিল!' কর্তার জবাব: 'সেটাই তো তুমি চাও। নিজে সব কাজ পেরে ওঠো না, আবার রাঁধুনিও রাখবে না।' গিন্নি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন: 'হ্যাঁ, তা তো বটেই! তোমার রাঁধুনির রান্নার যা ছিরি, তা কি কেউ মুখে তুলতে পারে?' কর্তাটি আর কথা না বাড়িয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠে চলে গেলেন। গিন্নি এবার নিজের ভাত নিয়ে বসলেন। উড়িয়া চাকরটির ভাত-ব্যঞ্জন আলাদা রেখে দিলেন। গিন্নির খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম।

গিন্নি বললেন: 'আমার কাজ এগোনোর জন্যে সঙ্গে কেউ নেই। সকালে কর্তাকে চা-জলখাবার দিয়ে আমি চানে চলে যাই। ফিরে এসে পুজোয় বসি। চাকরটার ধাত, কাজকর্ম খুব নোংরা। ওকে দিয়ে সর্বত্র গোবর জলের ছড়া দিতে, ঘরের মেঝে, উঠোন ঝাঁটপাট দিয়ে সাফ করাতে, বাসনকোসন মাজাতে আমার বেলা দশটা হয়ে যায়। তারপর আমি আনাজ কুটতে, মশলা বাটতে বসি। তারপর রান্না। এতসব গুচ্ছের কাজ আমাকে একা হাতেই সারতে হয়। একজনও কেউ নেই

> '. . . কিন্তু ওরা কি তোমাকে আমার কাজ করতে দেবে?' 'আমি তো কারও দাসিবাঁদী নই; কারও যদি আমাকে দরকার পড়ে তার জন্যে যে-কাজ করার দরকার, আমি তা করব।'

পাশে, যে হাতে হাতে কাজটা একটু এগিয়ে দেবে। সেজন্যেই এত বেলা হয়ে যায়। কী করব বলো? বললাম: 'মা, আমি যদি আপনার একটু-আধটু কাজ করে দিই, তাহলে কি আপনার কিছুটা সুসার হতে পারে?' 'সে তো খুবই ভালো কথা! কিন্তু ওরা কি তোমাকে আমার কাজ করতে দেবে?' 'আমি তো কারও দাসিবাঁদী নই; কারও যদি আমাকে দরকার পড়ে তার জন্যে যে-কাজ করার দরকার, আমি তা করব।' তিনি জিগেস করলেন: 'তোমার জাত কী, বাছা?' আমি তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। গিন্নি বলে উঠলেন: 'আ হা হা হা! কী অনাসৃষ্টি দ্যাখো দেখি! তুমি তো দেখছি আমারই জাতের! তোমার এমনতর হাল কে করেছে গো? আমি আমার পোড়াকপালের কিছু কিছু কথা তাঁকে জানালাম। যখন তিনি শুনলেন যে আমার মা-ও মারা গেছেন, বললেন: 'আমার নিজের যদি একটা বেধবা মেয়ে থাকত, সে-ই তো এখন আমায় দেখতে পারত।' বললাম: 'মা! আজ থেকে আপনিই আমার মা। যতটা আমার সাধ্যে কুলোয়, আমি আপনার দেখভাল করব।' শুনে তিনি খুব খুশি হলেন।

ফিরে এসে নলিনীকে সব খুলে বললাম। এও বললাম, ওই গিন্নিকে আমি 'মা' ডেকেছি। সে বলল: 'বাঃ! খুব ভালো। এ-জগতে তুমি যত বেশি কুটুম্বিতে পাতাবে—জেনে রেখো বোন—ততই তোমার মঙ্গল।' পরের দিন আমি নলিনীর বাড়ির রোজকার ঘরকন্নার কাজকর্মের একটা বন্দোবস্ত করে, তার মেয়েটিকে কাঁখে নিয়ে আমার 'মা'-এর বাড়ি

> আমি রোজ সকালে-বিকেলে রামকুমারবাবুর বাড়ি যাই। হাতে হাতে 'মা'-কে কাজ এগিয়ে দিই। . . . এসবের জন্যে কর্তা-গিন্নি, দু-জনেরই আমার ওপর একটা টান এসে গিয়েছিল। ওঁরা আমাকে ভালোবাসতে লাগল।

পৌঁছে গেলাম। তিনি বললেন: 'তোমার এই বাসি কাপড়ে আমার কাজ করা তো চলবে না বাছা।' তিনি তাঁর নিজের একটা তসরের শাড়ি আমাকে পরতে দিলেন। আমি শাড়ি পরে চা-জলখাবার দিলাম। তারপর বসলাম আনাজ কুটতে, বাটনা বাটতে। চুলোয় এক পাত্তর জল চড়িয়ে দিলাম গরম করবার জন্যে। পুজো সারা হতেই মা হেঁশেলে ঢুকে পড়লেন। এরমধ্যে উড়িয়া চাকরটাও তার কাজকর্ম সব সেরে নিয়েছে। আমার কাজ শেষ। এখন আমি মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি।

ফিরে দেখি ঠাকমার ভাগনে অনাথ এসেছে আমার খোঁজে। কাউকে কিছু না বলে চলে আসাতে ওরা নাকি মনে ভারী আঘাত পেয়েছে। বললাম: 'আমি তো ঠাকমার অনুমতি চাইতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তো মানা করলেন। সেজন্যেই আমার কাউকে কিছু না বলে চলে আসতে হল। আমি কেমন মুষড়ে পড়ছিলাম। এক জায়গায় একটানা বেশি দিন আমার থাকতে ভালো লাগে না। ঠাকমাকে বোলো, কয়েকদিন বাদে আমি ফিরে যাব।' অনাথ দুপুরে ভাত খেয়ে চলে গেল।

কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। দুশ্চিন্তাও খানিকটা দূর হল। নলিনীর বাড়িতে পাকাপাকিভাবে থাকবার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই, বরং একটা সুবিধেমতো ঠাঁইয়ের বন্দোবস্ত করতে পারলেই আমি এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু তেমন সুযোগ এখনও আসেনি। আমি পড়শিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেরিয়েছি, কিন্তু কাউকেই আমার তেমন মনে ধরেনি—

একমাত্র রামকুমারবাবুর গিন্নি ছাড়া। নলিনী আমার সঙ্গে যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করে। কিন্তু ওখানে থাকলে আমাকে ফের ঠাকমার সাঁড়াশির প্যাঁচে পড়তে হবে। এছাড়া আর একটা কারণও আছে। আমি নিছক ভাত-কাপড়ের জন্যে বেঁচে থাকতে চাই না। আমার এখনও মনে মনে আশা—আমি আরও লেখাপড়া শিখব।

আমি রোজ সকালে-বিকেলে রামকুমারবাবুর বাড়ি যাই। হাতে হাতে 'মা'-কে কাজ এগিয়ে দিই। বিকেলে রুটি বেলি, ভাজি, তরকারি রাঁধি, দুধ জ্বাল দিই। 'মা'-র পাকা চুল তুলে দিই। এসবের জন্যে কর্তা-গিন্নি, দু-জনেরই আমার ওপর একটা টান এসে গিয়েছিল। ওঁরা আমাকে ভালোবাসতে লাগল। গিন্নি বললেন: 'আমার মেয়েটা যেমন হবে আমি ভাবতাম, সেই জায়গাটা তুমি নিয়ে নিয়েছ। আমাকে বলো, কী করলে তুমি পুরোপুরি আমার হবে?' বললাম: 'তা করতে হলে দরকার, এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে থাকা।' 'তা তো হয় না, বাছা। ওরা রেগে যাবে, আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে। শেষ অব্দি পড়শিতে-পড়শিতে কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ, মান-অভিমান, মুখ-দেখাদেখি বন্ধ—না, না, তা হয় না।' 'আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না! আমরা যদি কোথাও বেড়াতে যাই?' 'মা' বললেন: 'হুঁ! এইটি বেশ ভালো মতলব। আমাকে তো শিগগিরই চন্দ্রনাথের বাড়ি যেতে হবে। ঠিক আছে, তুমি ওদেরকে বলো, আমাদের সঙ্গে যেতে চাও। দেখি, ওরা কী বলে?'

আমি নলিনীকে এসে বললাম—আমার চন্দ্রনাথের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার কথা। নলিনী রাজি হল না, বলল: 'ঠাকমাকে না-জানিয়ে যাওয়াটা তোমার মোটেই উচিত হবে না।' আমি বেশ বিরক্ত হলাম।

'ভগবানের দয়ায় এতদিন বাদে শেষমেশ আমি একটা মেয়ে পেয়েছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, সে যেন পাকাপাকিভাবে আমার সঙ্গে থাকতে পারে।'

'মা' আমাকে একজোড়া শাড়ি, একজোড়া শেমিজ আর দুটো ব্লাউজ দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু কিন্তু করছিলাম। কিন্তু 'মা' তো কারও মুখে না শোনার পাত্র নন। তিনি তাঁর ছেলে, শরৎ দাদাকে চিঠি লিখলেন: 'ভগবানের দয়ায় এতদিন বাদে শেষমেশ আমি একটা মেয়ে পেয়েছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, সে যেন পাকাপাকিভাবে আমার সঙ্গে থাকতে পারে।' তিনি জবাব দিলেন: 'মা, সত্যিই কি তোমার একটা মেয়ে হয়েছে? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। এতসব ঘটে গেল—তার বিন্দুবিসর্গ, কিচ্ছুটি আমরা টের পেলাম না!' 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে না কি মাথাখারাপ? এই বুড়ি বয়েসে কেউ কি বাচ্চা বিয়োয়? তোমরা সবাই ভালোভাবে বেঁচেবর্তে থাকো—এর বেশি কোনো আশা আমি করি না। একটা মেয়ের জন্যে মনে মনে হত্যে দিয়ে পড়েছিলাম। ভগবান আমার সে আশ মিটিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন পরম নিশ্চিন্তে, আরামে দিন কাটাচ্ছি। হেম আমাকে দু-হাত দিয়ে আগলে রাখে,

পাঁচজনে কী ভাববে-না-ভাববে, সেসব ধরে ধরে কাজকর্ম করতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছি—কবে যে এইসবের হাত থেকে রেহাই মিলবে!

কুটোটি নাড়তে দেয় না। বউমাকে পাঠানোর কোনো দরকার নেই। শিগগিরই আমরা তোমার বাড়ি যাব, কিছুদিন থাকব।' 'মা'-এর হয়ে সব চিঠি আমিই লিখে দিতাম। কয়েকদিন বাদে তাঁর জ্বর এল। নলিনীর অনুমতি নিয়ে 'মা'-এর কাছে রাতে থেকে গেলাম। সকালবেলা 'মা'-এর গেরস্থালির কাজকর্ম সেরে, নলিনীর মেয়েটিকে নিয়ে ফের তাঁর বাড়ি চলে যেতাম। মেয়েটিকে 'মা'-এর কাছে রেখে ঘরকন্নার আর সব কাজ সারতাম। ওখানেই চান করতাম, কখনো কখনো দুপুরের ভাতও খেয়ে নিতাম। মাঝে মাঝে নলিনী আসত মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়াতে। 'মা'-এর সমস্ত কাজকর্ম সেরে নলিনীর বাড়ি ফিরে যেতাম, ফের রাতে 'মা'-এর সঙ্গে শুতে আসতাম। নলিনীর বাড়িতে আমাকে একা একটা ছোট্টো কুঠুরির মধ্যে শুতে হত। সেজন্যে 'মা' একদিন বললেন: 'তুমি বরং আমার এখানেই চলে এসো, এখানেই আমার কাছে শোবে।' আমার ভালো লাগল। এতদিন বাদে আমি একজন 'মা'-এর ভালোবাসা পেয়েছি। মনে যেন অনেকটা শান্তি ফিরে পেলাম।

একদিন রামকুমারবাবুকে বললাম: ' "বাবা", আপনি যদি চান, তাহলে আমরা সবাই মিলে তো চন্দ্রনাথের বাড়ি যেতেই পারি।' তিনি জবাব দিলেন: 'বলো, কবে তুমি যেতে চাও।'

রামকুমারবাবু দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাদের বেড়াতে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে ফেললেন। আমরা সব মালপত্তর বাঁধাছাঁদা করে নিলাম। সুপুরি কেটে, মশলা পিষে আরও টুকিটাকি নানা কিছু করে সব গোছগাছ করে নিলাম। আমি আমার ক্যানভাস ব্যাগটা এনে তার ভেতর যতটা পারা যায় জিনিসপত্তর ঠেসেঠুসে ভরে দিলাম। আমার শাড়ি-জামাকাপড় ভরলাম 'মা'-এর তোরঙ্গে। নলিনীর কোনো শেমিজ ছিল না, সেজন্যে 'মা' আমাকে যে শেমিজ আর ব্লাউজ দিয়েছিলেন

তার থেকে একটা করে আমি ওকে দিয়েছিলাম। নলিনীর কাছে আমার সামান্য যে টাকা রাখা ছিল সেটা ফেরত নিয়ে নিলে, ও জিগেস করল: 'এখন তুমি টাকা দিয়ে কী করবে?' সবরকম অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে বললাম: ' "মা"-এর কাছে জমা রাখব।' ও বেশ অবাক হয়ে গেল। বুঝলাম, মনে ঘা-ও খেয়েছে। বললাম: ' "মা" এই টাকা সুদে খাটাবেন। সুদের টাকাটা পাব আমি। সেজন্যেই টাকাটা আমি ওঁর হাতে তুলে দিচ্ছি।' পাঁচজনে কী ভাববে-না-ভাববে, সেসব ধরে ধরে কাজকর্ম করতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছি—কবে যে এইসবের হাত থেকে রেহাই মিলবে!

দিন কয়েক বেড়াতে যাওয়ার গোছগাছেই কেটে গেল। একদিন বিকেলে 'বাবা' আমাদের বললেন: 'কালকেই আমাদের রওনা দিতে হবে।' 'মা' বললেন: 'কিন্তু আমরা তো সকালে বেরোতে পারব না। হেমকে তো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওরা যদি হেমকে আটকে দেয় তখন!' 'বাবা' বললেন: 'তাও তো ঠিক! তাহলে কী করব আমরা এখন?' 'মা' বললেন: 'আমরা রাতেই বেরিয়ে যাই না কেন!' 'বাবা'-র মধ্যে একটা দোনোমনা ভাব; বললেন: 'রাতে বেরোনাটা কি খুব সুবিধে হবে? হবে না।' 'মা' বললেন: 'কেন হবে না? আমরা রাতে বেড়িয়ে সকালে স্টিমারে চড়ে বসব।' 'বাবা' এ-কথায় সায় দিলেন। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা লুচি ভাজতে বসলাম, আলুরদম

'তোমার বাড়িতে মেয়েটাকে আটকে রেখেছ কেন?' 'মা' বললেন: 'কোথায় ফেলব ওকে?

বানালাম, দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে মেরে ক্ষীর বানালাম। গান্ডারিয়া স্টেশনে গেলাম পায়ে হেঁটে। আমার ভেতরটা যেন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছিল। মালি একটার পর একটা তল্পিতল্পা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এনে রাখছিল। 'বাবা' আমাদের মধ্যে এসে পড়লেন। ট্রেন ছাড়বে সাড়ে-এগারোটায়—প্রায় মাঝ রাত। গোটা গাঁ তখন গাঢ় ঘুমে—টেরই পায়নি কিছু তা জিজ্ঞাসাবাদ করবে কী করে।

আমরা রাত একটায় নারায়ণগঞ্জে পৌঁছোলাম। 'বাবা' বললেন: 'মনে হয়, কুমুদের বাড়িতে না-ওঠাই ভালো।' 'মা' বললেন: 'থাকব কোথায় তাহলে আমরা?' 'বাবা' বললেন: 'সোজা স্টিমারে গিয়ে শুয়ে পড়ি, চলো।' আমরা তাই করলাম। একটা কেবিন ভাড়া করে আমরা তিনজন সেখানে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন যে স্টিমার ছেড়ে দিয়েছে, টেরই পাইনি তা। বেশ বেলায় ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, স্টিমার অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আর একটু পরেই পড়বে নরসিংদি। আমার ভেতরটা তখন ভয়ে ধুকপুক করছে—পাছে ফের না ওদের কবজায় পড়ে যাই! হে ভগবান! আমাকে দাবার বোড়ে করে কী চাল চেলে চলেছ তুমি! যা হোক, আমরা চাঁদপুর হয়ে চিটাগাং আর চন্দ্রনাথের বাড়ি গেলাম। সময়মতো সব তীর্থও ঘুরে নেওয়া হল। 'মা' বললেন: 'হেম, এখানে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন, ওঁকে আমরা চিনি। ভাবছি, ওঁর ওখানেই উঠব, থাকব ক-টা দিন। তুমি কী বলো?' জিগেস করলাম: 'কী নাম ওঁর?' তিনি বললেন: 'চন্দ্রশেখর কর।' বললাম: '"মা", ও-বাড়িতে আমি উঠতে পারব না। কেননা উনি আমার পরিচিত, সত্যি কথা বলতে কী বিয়ের সুবাদে আমার কুটুম।' 'মা' বললেন: 'তাহলে তো ও-বাড়িতে আমাদের ওঠার কোনো কথাই ওঠে না। বেশ, তাহলে দিন কতক পাণ্ডা-র* বাড়িতেই থাকব।' কয়েকটা দিন ওখানে থেকে আমরা রাজশাহী যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দিলাম। পর দিন রওনা দিলাম রাজশাহীর দিকে—সোজা যাত্রাপথ ধরে। আমরা চাঁদপুর থেকে রাজশাহী যাওয়ার স্টিমারে চড়ে বসলাম। শরৎ দাদা আমাদের খুবই যত্ন-আত্তি-খাতির করলেন। 'মা' তাঁর ছেলে আর বউমার কাছে আমার নামে একরাশ প্রশস্তি করলেন। সব শুনেটুনে শরৎ দাদা তাঁর মা-কে বললেন: 'তোমার বাড়িতে মেয়েটাকে আটকে রেখেছ কেন?' 'মা' বললেন: 'কোথায় ফেলব ওকে? আমার নিজের পেটের মেয়ে তো নেই; ও-ই আমার মেয়ে, ওর দেখাশোনা আমি করব না তো কে করবে শুনি?' 'সে খুব ভালো কথা, তুমি তা করতেই পারো; কিন্তু তুমি যখন থাকবে না তখন ওর কী হবে—ভেবে দেখেছ একবার! ও তো কিছু লেখাপড়া শিখেছে, ওকে যদি একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কি সেটা ওর জন্যে সবথেকে ভালো হয় না?' 'মা'-এর কথাটা মোটেই ভালো লাগল না। কিন্তু ছেলে তাঁর কথা কানেই তুলতে চাইছেন না—কেননা যে রাজার ওকালতি কাজকর্ম তিনি দেখাশোনা করেন সেই রাজা তাঁর বউয়ের জন্যে একজন শিক্ষক খুঁজছিলেন। শরৎ দাদার ওপর ভার পড়েছে খুঁজে দেওয়ার। তিনি চান আমাকে ওই পদে ঢুকিয়ে দিতে। মাস-মাইনে পঞ্চাশ টাকা, থাকা-খাওয়ার জন্যে একটি পয়সাও দিতে লাগবে না। তিনি 'মা'-এর আড়ালে আমাকে ধরে বোঝাতে লাগলেন: 'এইভাবে হেলাফেলায় সময় নষ্ট করে কী লাভ বলো তো? আমার কথা শোনো, বোন, এই কাজটা তুমি নিয়ে নাও।' আমি সায় দিলাম। শরৎ দাদা তক্ষুনি তাঁর মাকে গিয়ে বললেন: 'হেম রাজি হয়েছে, তুমি আর বাধা দিও না তো বাপু। আমি সব কথা লিখলাম 'মা'-এর মেজো ছেলে জ্যোতিষকে, যে আবার গোপালেন্দ্রনারায়ণের জমিদারির নায়েব। তিনি বি এ পাশ করেছেন, এম এ পাশ করেছেন, মাস-মাইনে পাঁচশো টাকা। তিনি ওখানে পরিবার নিয়ে থাকেন। 'মা'-এর তাঁর ওখানে যাওয়ার কথা। (চলবে)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

*তীর্থে তীর্থযাত্রীদের পুজোআচ্চা, তীর্থস্থান ঘুরিয়ে দেখানো, থাকা-খাওয়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত করেন যে ব্রাহ্মণ, তাঁকে পাণ্ডা বলা হয়।

অটিজ়ম: বৈশিষ্ট্য ও চিকিৎসা

রুমঝুম ভট্টাচার্য্য

আপনার বাচ্চা আপনি ডাকলে কি চট করে সাড়া দিতে পারছে না? আপনি কি তার মধ্যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতায় কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছেন? সে হয়তো পরিবেশের মধ্যের খুব অল্প পরিবর্তনে ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া করছে, যেমন সামান্য আলো বা শব্দে ভীষণ চমকে উঠছে। আবার উলটোটাও হতে পারে, যেমন পরিবেশের বড়ো কোনো পরিবর্তনেও ভীষণভাবে উদাসীন হয়ে থাকছে। তার আচরণে সমতার অভাব দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সে গুছিয়ে নিজের কাজ তার বয়সি অন্য বাচ্চাদের মতো করতে পারছে না। তার সঙ্গে মৌখিক বা আকার-ইঙ্গিতে যোগাযোগ করা বেশ কষ্টসাধ্য হচ্ছে, এমনকী সে চোখে চোখ মেলাতে পারে না। সে কোনো ইশারা বোঝে না। তার মুখে ভালো লাগা বা মন্দ লাগার কোনো অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তার একই মুভমেন্ট বার বার করার প্রবণতা আছে, যেমন সে দুলছে তো দুলছে বা হাত একই রকম-ভাবে নাড়াচ্ছে তো নাড়াচ্ছে কি তালি বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছে। তাকে কোনো কথা বললে বা প্রশ্ন করলে সে তৎক্ষণাৎ সেটা পুনরাবৃত্তি করছে। হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো বিশেষ জিনিসের প্রতি তার অদ্ভুত রকমের একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। বাচ্চাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তন হলে সে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া করছে। খুব বেশি কান্নাকাটি করছে বা ভীষণ রকমের জেদ করছে। এমন সব লক্ষণ দেখলে বুঝতে হবে বাচ্চাটির সমস্যা আছে এবং সে ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এই সব লক্ষণগুলির বেশিরভাগ উপস্থিত আছে মানে বাচ্চাটির অটিস্টিক হবার সম্ভাবনা প্রবল।

অটিজ়ম কী?

শিশুর মধ্যে প্রধানত তিন ধরনের বিকাশজনিত অসঙ্গতির (developmental anomalies) লক্ষণকে অটিজ়ম স্পেক্ট্রাম ডিসঅর্ডারের নির্ধারক মনে করা হয়—

১. সামাজিক মেলামেশাতে সমস্যা (social interaction)।
২. অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা (communication)।
৩. কথা বলা ও বৌদ্ধিক বিকাশে সমস্যা (language and cognitive skill)।

অটিজ়ম স্পেক্ট্রাম ডিসঅর্ডার আসলে কোনো একটি মাত্র সমস্যা নয় বা রোগ নয়। “স্পেক্ট্রাম” শব্দটির ব্যবহার থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন বিকাশজনিত অসঙ্গতিকে এই শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। আর এই অসঙ্গতি মূলত বাচ্চার পরিবেশ বা তার পারিপার্শ্বিক মানুষজনের সঙ্গে যোগের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। সে যেন বিচ্ছিন্ন এক সত্তা যার প্রতিক্রিয়া করার ধরন অন্য বাচ্চাদের তুলনায় আলাদা, যার সংবেদনশীলতার মাত্রাও ভিন্নধর্মী।

অটিস্টিক শিশুরা অন্য শিশুদের তুলনায় আলাদা কেন?

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক)-এর মাধ্যমে চারপাশের পরিমণ্ডল থেকে, এমনকী আমাদের দেহ থেকেও, ক্রমাগত তথ্য আমাদের মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়। মস্তিষ্কে এই তথ্যগুলির নির্বাচন দ্রুত সম্পন্ন হয়। নিজেদের দেহের সমতা রক্ষার খাতিরে এবং পরিবেশের উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার প্রয়োজনে কেবলমাত্র দরকারি তথ্যগুলিই ছেঁকে নেওয়া হয়। আর অন্য তথ্য যেগুলি সেই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় সেগুলিকে ছাঁটাই করে নিয়ে বাতিল করা হয়। তারপর দরকারি তথ্যগুলিকে প্রক্রিয়াকরণের (processing) মাধ্যমে অর্থপূর্ণ করে তুলে যথাযথ কার্যকরী প্রতিক্রিয়া (response) তৈরি করা হয়। এই ছেঁকে তোলার কাজটা ঠিক মতো না হলে বা প্রক্রিয়াকরণে অসুবিধা দেখা দিলে তখন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা যাবে। আর ঠিক এমনটাই ঘটে অটিজ়ম স্পেক্ট্রাম ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া যাকে আমরা ফিলটারিং বলি তার মধ্যে অসুবিধা থাকে বলে অটিস্টিক বাচ্চাদের মধ্যে উদ্দীপকের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা বা খুব কম সংবেদনশীলতা দেখা যায়। উদাহরণ

দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে পরিমণ্ডল থেকে অনেক তথ্য আমাদের মস্তিষ্কে যাচ্ছে যেমন বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ, বিভিন্ন বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলো যার জন্য বস্তুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে—এই সব কিছু তথ্য আমাদের মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্বাচিত হচ্ছে না। তাই কিছু বিশেষ শব্দ আমরা শুনছি বা বিশেষ বস্তু আমরা দেখছি। কিন্তু ফিলটারিং এ সমস্যা থাকলে হয়তো যেটা প্রয়োজন সেটা দেখতে বা শুনতে পারা গেল না অথবা খুব অপ্রয়োজনীয় সামান্য আওয়াজ বা সেই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষিত হল। এমনটা অটিস্টিক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায়।

এত গেল নির্বাচন পদ্ধতি। আবার প্রক্রিয়াকরণেও সমস্যা থাকতে পারে। সংবেদনশীলতার বিভিন্ন উপাদানের একীভবন বা সমন্বয় সাধন (sensory integration) আমাদের জন্মগত দৈহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ থেকে অনেক উদ্দীপকগুলোর মধ্যে সঠিকটি বেছে নিয়ে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া করতে পারি। কিন্তু অটিস্টিক বাচ্চাদের এই সমন্বয় সাধনের সমস্যা থাকায় তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ (information processing)-এ অসুবিধা হয়, তারা গুছিয়ে আচরণ করতে পারে না, বিকাশজনিত সমস্যার মুখোমুখি হয়। অর্থাৎ এই পৃথিবীর রূপ, রস গন্ধ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে বাইরে থেকে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে যে সমস্ত তথ্য, সেগুলিকে গ্রহণ করে, যথাযথভাবে রেজিস্টার করে, সাজিয়ে গুছিয়ে ও ব্যাখ্যা করাকেই সংবেদনশীলতার সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া বা সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন বলা হয়। যেমন বাইরের জগৎ থেকে কিছু তথ্য মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে তেমন আমাদের শরীর থেকেও কিছু অন্তর্বর্তী তথ্য মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে।

যেমন, আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা, আমাদের শরীরের নড়াচড়া, আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা—আমাদের মস্তিষ্ক এই সব তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উপযুক্ত রেসপন্স বা আচরণ তৈরি করে। অটিজ়মের ক্ষেত্রে শিশুরা নিজেদের শারীরিক অবস্থান বুঝতে পারে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে না। সে কারণে দেখা যায় তারা সঠিকভাবে তাদের নিজের হাত পায়ের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে ঝুঁকে চলছে, দুলছে তো দুলছে কিংবা তালি দিচ্ছে বা ডাকলে সাড়া দিতে পারছে না কি চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। অর্থাৎ অটিজ়ম মূলত নিউরোলজিক্যাল অসুবিধার কারণে তৈরি হয়।

তবে কি অটিস্টিক বাচ্চা বুদ্ধির দিক থেকে অন্য বাচ্চাদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে?

দু-রকম হতে পারে। কোনো কোনো অটিস্টিক বাচ্চা বুদ্ধির দিক থেকে স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে উপরে থাকে, আবার কিছু শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ স্বাভাবিক বুদ্ধির গণ্ডির তুলনায় নীচে থাকে। অভিজ্ঞ মনোবিদ বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধির মাত্রা নির্ধারণ করে থাকেন, তার সঙ্গে শিশুর বিভিন্ন অসুবিধার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে সঠিক মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে একজন শিশুর চিকিৎসার প্ল্যান করা সম্ভব।

চিকিৎসা

অটিজ়মের চিকিৎসায় তিনটি বিষয় মাথায় রেখে এগোনো প্রয়োজন।

১. শিশুর উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়ার দক্ষতার উন্নতিসাধন (sensory integration skill)।

২. শিশুর বৌদ্ধিক দক্ষতার উন্নতিসাধন (intellectual skill)।

৩. অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতার উন্নতিসাধন (communication skill)।

অটিজ়ম নামক অসঙ্গতির সঙ্গে লড়াই করতে হলে ডাক্তার, স্পিচ থেরাপিস্ট, সোশ্যাল ওয়ার্কার, মনোবিদ, অকুপেশন্যাল থেরাপিস্ট সবাই মিলে কাজ করতে হবে। যেহেতু অটিজ়ম নিউরোলজিক্যাল অসঙ্গতির কারণে তৈরি একটা বিশেষ অবস্থা তাই এটিকে রোগ না বলে বিশেষ অসুবিধাজনক পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করে সেই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে একটা খুব সরাসরি প্রশ্নের মুখোমুখি প্রায়ই হতে হয়, 'অটিজ়ম কি সারে?' তার সরাসরি উত্তর একটাই। ডায়াবেটিস যেমন সারে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ নির্ণয় করে রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় মাত্র, তেমনি অটিজ়মের সাথে লড়াই করতে হবে আর তার জন্য খুব ছোটো বয়সে এই অবস্থা নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। চিন্তার কথা এই যে একবিংশ শতাব্দীর ভারত ডিজিট্যাল হয়েছে বটে কিন্তু আজও এ দেশে সব মানুষের চিকিৎসার ভার ভারত সরকার নিয়ে উঠতে পারেনি। সেখানে এই শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বলিত ইউনিট গড়ে তোলার স্বপ্ন অলীক কল্পনা মনে হয়। তবু অটিজ়ম নামক বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। অভিজ্ঞতা বলছে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ যেখানে মারণব্যাধির চিকিৎসা করাতে অসমর্থ সেখানে অটিজ়মের মতো সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের 'পাগল' বা 'জড়ভরত' তকমা লাগিয়ে ব্রাত্য করে রাখা হয়, বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হতে হয় এদের।

এই মানুষগুলির হয়ে তাঁদের কথা পৌঁছে দেবার আশু প্রয়োজন আছে, না হলে মানবিকতার মুখ মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে। মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারও ফাঁকা আওয়াজ মনে হবে। আপনারা কী বলেন? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখিকা একজন সাইকোলজিস্ট।

রক্তের গ্রুপ ও রক্তদান

আপনার রক্তের গ্রুপ কী হবে তা নির্ভর করে আপনার মা-বাবার কাছ থেকে আপনি কোন জিন পেয়েছেন তার ওপর। প্রধান ব্লাড গ্রুপ চারটে এ, বি, এবি এবং ও। প্রত্যেকটা গ্রুপে আবার পজিটিভ আর নেগেটিভ, অর্থাৎ সব মিলিয়ে আটটা গ্রুপ। www.nhs.uk/conditions/blood-groups/ অবলম্বনে লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

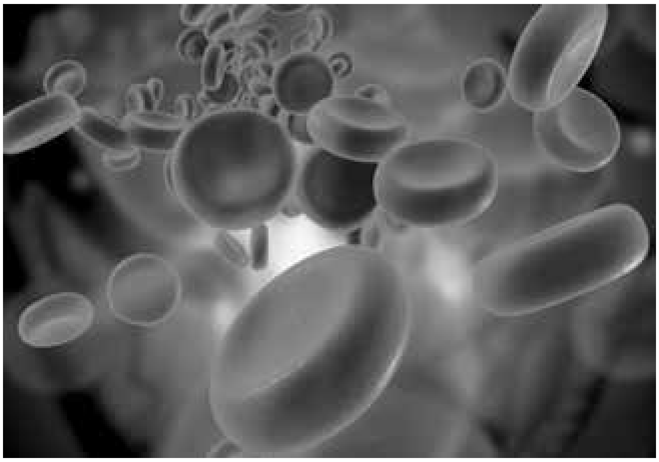

চিত্র ১.

আমাদের রক্তে লাল রক্ত কোশ, সাদা রক্ত কোশ আর অনুচক্রিকা রক্তরস বা প্লাজমায় ভাসমান থাকে। রক্তে উপস্থিত অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি দিয়ে রক্তের গ্রুপ নির্ধারিত হয়।

এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি হল রক্তরসে উপস্থিত প্রোটিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হল অ্যান্টিবডি। জীবাণুর মতো বিদেশি আগন্তুককে চিনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সতর্ক করে সেগুলিকে ধ্বংস করে। আর অ্যান্টিজেন হল লাল রক্ত কোশের উপরিতলে উপস্থিত প্রোটিন অণু।

রক্তের গ্রুপের এবিও (ABO)

চারটে প্রধান গ্রুপ—

- এ গ্রুপ—লাল রক্ত কোশে থাকে ‘এ’ অ্যান্টিজেন আর প্লাজমায় ‘বি-বিরোধী’ অ্যান্টিবডি।
- বি গ্রুপ—লাল রক্ত কোশে থাকে ‘বি’ অ্যান্টিজেন আর প্লাজমায় ‘এ-বিরোধী’ অ্যান্টিবডি।
- ও গ্রুপ—লাল রক্ত কোশে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না আর প্লাজমায় ‘এ-বিরোধী’ এবং ‘বি-বিরোধী’ অ্যান্টিবডি দুই-ই থাকে।
- এবি গ্রুপ—লাল রক্ত কোশে ‘এ’ এবং ‘বি’ দুই অ্যান্টিজেনই থাকে আর প্লাজমায় কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না।

ভুল এবিও গ্রুপের রক্ত দিলে জীবন সংশয় হতে পারে। মনে করুন ‘বি’ রক্তের গ্রুপের কোনো মানুষকে ‘এ’ গ্রুপের রক্ত দেওয়া হল। মানুষটির রক্তরসে থাকা ‘এ-বিরোধী’ অ্যান্টিবডি ‘এ’ গ্রুপের রক্তকোশগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই ‘এ’ গ্রুপের রক্ত যার ‘বি’ গ্রুপ তাকে দেওয়া যাবে না। উলটো দিকে ‘বি’ গ্রুপের রক্ত দেওয়া যাবে না যার ‘এ’ গ্রুপ তাকে।

তবে ‘ও’ গ্রুপের রক্তের লাল রক্ত কোশে ‘এ’ বা ‘বি’ কোনো অ্যান্টিজেনই নেই, তাই ‘এ-বিরোধী’ বা ‘বি-বিরোধী’ কোনো অ্যান্টিবডি দিয়ে তার ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

পজিটিভ আর নেগেটিভ

অনেকের লাল রক্ত কোশে আরেকরকম অ্যান্টিজেন থাকে, যার নাম আরএইচডি (RhD) অ্যান্টিজেন। এই অ্যান্টিজেনটা থাকলে রক্তের গ্রুপ আরএইচডি পজিটিভ, কেবল পজিটিভও বলা হয়। এই অ্যান্টিজেন না থাকলে আরএইচডি নেগেটিভ বা কেবল নেগেটিভ।

এবিও এবং আরএইচডি ধরে তাহলে ৮টি রক্তের গ্রুপ হতে পারে।

- এ আরএইচডি পজিটিভ (A+)
- এ আরএইচডি নেগেটিভ (A-)
- বি আরএইচডি পজিটিভ (B+)
- বি আরএইচডি নেগেটিভ (B-)
- ও আরএইচডি পজিটিভ (O+)
- ও আরএইচডি নেগেটিভ (O-)
- এবি আরএইচডি পজিটিভ (AB+)
- এবি আরএইচডি নেগেটিভ (AB-)

‘ও’ নেগেটিভ রক্ত নিরাপদে যে কাউকেই দেওয়া যায়, কেননা

এদের লাল রক্ত কোশে এ, বি বা আরএইচডি—কোনো অ্যান্টিজেনই নেই। তাই জরুরি অবস্থায় 'ও' নেগেটিভ রক্ত যে কাউকেই দেওয়া যায়।

ভারতে কোন গ্রুপ বেশি দেখা যায়?

সবচেয়ে বেশি দেখা যায় 'ও' গ্রুপ (৩৭.১২%), তার পর যথাক্রমে 'বি' (৩২.২৬%), 'এ' (২২.৮৮%) এবং 'এবি' (৭.৭৪%)। দাতাদের মধ্যে ৯৪.৬১% আরএইচডি পজিটিভ আর বাকিরা আরএইচডি নেগেটিভ।

ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা

যাঁর ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হবে, তাঁর লাল রক্ত কোশগুলিকে বিভিন্ন অ্যান্টিবডি দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে দেখা হয়। অ্যান্টি-বি অ্যান্টিবডির দ্রবণ যদি মেশানো হয় আর লাল রক্ত কোশে যদি বি অ্যান্টিজেন থাকে তাহলে জমাট বেধে যাবে, তাহলে ব্যক্তির ব্লাড গ্রুপ 'বি'।

অ্যান্টি-এ আর অ্যান্টি-বি কোনো অ্যান্টিবডিতেই যদি রক্ত জমাট না বাধে, তার অর্থ লাল রক্ত কোশে কোনো অ্যান্টিজেন নেই, রক্তের গ্রুপ 'ও'।

রক্ত সঞ্চালন বা ব্লাড ট্রান্সফিউশনে দাতার রক্ত গ্রহীতাকে দেওয়া হয়, সেখানে একই এবিও গ্রুপ এবং আরএইচডি গ্রুপের রক্ত দেওয়া হয়। তারপরও দাতা ও গ্রহীতার রক্তের নমুনা মিলিয়ে দেখা হয়।

গর্ভাবস্থা ও ব্লাড গ্রুপ

গর্ভবতী মহিলাদের সব সময় ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। মায়ের রক্তের গ্রুপ যদি আরএইচডি নেগেটিভ হয় এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের যদি ব্লাড গ্রুপ বাবার সূত্রে আরএইচডি পজিটিভ হয়, তাহলে জটিলতা হয়।

সন্তানের জন্ম দিতে পারেন এমন বয়সের আরএইচডি নেগেটিভ গ্রুপের মহিলাদের কেবল আরএইচডি নেগেটিভ রক্তই দিতে হয়।

২০ বছরের কম বয়সি মহিলার ওজন যদি ৬৫ কিলোগ্রামের কম হয় অথবা উচ্চতা যদি সাড়ে পাঁচ ফুটের কম হয়, তাহলে রক্ত নেওয়ার আগে তার শরীরে রক্তের আয়তন হিসেব করে নেওয়া উচিত।

রক্তদান

আপনি রক্ত দিতে পারেন, যদি আপনি—

- ➡ সুস্থ হন।
- ➡ ওজন যদি অন্তত ৫০ কিলোগ্রাম হয়।
- ➡ বয়স যদি ১৭ থেকে ৬৬ বছরের মধ্যে হয় (আগে যদি আপনি রক্ত দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্য ৭০ বছর বয়স অবধি রক্ত দেওয়া হয়।)
- ➡ ৭০ বছরের ওপরেও রক্ত দেওয়া যায় যদি শেষ দুই বছরের মধ্যে আপনি রক্ত দিয়ে থাকেন।

কত দিন ছাড়া ছাড়া রক্ত দান করা যায়?

- ☞ পুরুষরা রক্ত দিতে পারেন ১২ সপ্তাহ ছাড়া,
- ☞ মহিলারা দিতে পারেন ১৬ সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া।

রক্তদান করা যাবে কিনা দেখে নিন, যদি—

- ☞ আপনার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বা না হয়ে চিকিৎসা চলে।
- ☞ আপনি কোনো ওষুধ খান।
- ☞ বিদেশ ভ্রমণ করে থাকেন।

গর্ভবতী মহিলাদের সব সময় ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। মায়ের রক্তের গ্রুপ যদি আরএইচডি নেগেটিভ হয় এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের যদি ব্লাড গ্রুপ বাবার সূত্রে আরএইচডি পজিটিভ হয়, তাহলে জটিলতা হয়।

- ☞ শরীরে উল্কি বা কিছু বেঁধানো থাকে।
- ☞ গর্ভাবস্থার সময় বা তার পরে।
- ☞ আপনার অসুস্থ লাগে।
- ☞ ক্যান্সার থাকে।
- ☞ রক্ত, রক্তের কোনো উপাদান গ্রহণ এবং কোনো অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের পর।

রক্তদাতা হিসেবে পুরুষ ও মহিলা

রক্তদাতা হিসেবে পুরুষদের বেশি পছন্দ করা হয়, কেননা—

- ✦ পুরুষদের ওজন বেশি অর্থাৎ তাদের লোহার মাত্রা যথাযথ।
- ✦ মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের রক্তে ইমিউন কোশ কম থাকে তাই তাদের প্লাজমা অনেককে দেওয়া যায়।

✦ পুরুষদের অনুচক্রিকার সংখ্যা মহিলাদের তুলনায় বেশি, প্লেটলেট দাতা হিসেবেও তারা বেশি উপযুক্ত।

রক্তদাতা হিসেবে ২০ বছরের কম বয়সি মহিলারা

২০ বছরের কম বয়সি মহিলার ওজন যদি ৬৫ কিলোগ্রামের কম হয় অথবা উচ্চতা যদি সাড়ে পাঁচ ফুটের কম হয়, তাহলে রক্ত নেওয়ার আগে তার শরীরে রক্তের আয়তন হিসেব করে নেওয়া উচিত।

রক্ত দেবেন না যদি—

⇨ মনে হয় আপনার এইচআইভি/এডস, HTLV (হিউম্যান টি-লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস) বা হেপাটাইটিসের জন্য পরীক্ষা করা দরকার।

⇨ এইচআইভি পজিটিভ হন।

⇨ হেপাটাইটিস 'বি'-র বাহক হন।

⇨ হেপাটাইটিস 'সি'-র বাহক হন।

⇨ HTLV পজিটিভ হন ।

⇨ আপনার সিফিলিস হয়ে থাকে বা সিফিলিসের জন্য চিকিৎসা হয়ে থাকে।

⇨ কখনো ড্রাগ ইঞ্জেকশন নিয়ে থাকেন।

তিন মাসের মধ্যে রক্ত দেবেন না যদি—

যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে থাকেন।

যৌন সম্পর্কের অন্তত তিন মাসের মধ্যে রক্ত দেবেন না, যদি—

➢ আপনি পুরুষ হন এবং অন্য পুরুষের সঙ্গে মুখমৈথুন বা পায়ুকাম করে থাকেন, কন্ডোম বা অন্য সুরক্ষাব্যবস্থা নিলেও নয়।

➢ যদি আপনি মহিলা হন এবং এমন এক পুরুষের সঙ্গে আপনার যৌন সম্পর্ক হয় যিনি কখনো অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মুখমৈথুন বা পায়ুকাম করেছেন, কন্ডোম বা অন্য সুরক্ষাব্যবস্থা নিলেও নয়।

➢ যদি আপনার যৌনসঙ্গী—

- এইচ আইভি পজিটিভ হন।
- হেপাটাইটিস 'বি'-র বাহক হন।
- হেপাটাইটিস 'সি'-র বাহক হন।

রক্ত দেবেন না যদি—এইচআইভি পজিটিভ হন। . . . আপনার সিফিলিস হয়ে থাকে বা সিফিলিসের জন্য চিকিৎসা হয়ে থাক। কখনো ড্রাগ ইঞ্জেকশন নিয়ে থাকেন।

- HTLV পজিটিভ হন।
- সিফিলিস পজিটিভ হন।

➢ যৌনসঙ্গী কখনো যৌন সম্পর্কের জন্য অর্থ বা ড্রাগ নিয়ে থাকেন।

➢ যৌনসঙ্গী কখনো ড্রাগ ইঞ্জেকশন নিয়ে থাকেন।

➢ যৌনসঙ্গী যদি পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে এইচআইভি/এডস-এর প্রাদুর্ভাব, সেখানে যৌনসংসর্গে সক্রিয় থাকেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সর্বক্ষণের চিকিৎসক।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:
কলকাতা: সুমন্ত বিশ্বাস (৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (৬৯৮৮-২২৪১), বই-চিত্র (কফি হাউস তিনতলা), পাতিরাম, ক্রান্তিক, মনীষা (কলেজ স্ট্রিট), অমর কোলে (বি.বা.দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন) সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী), রথীন-দা (গোলপার্ক) সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)।
যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

বোমারু বিমান ও কুষ্ঠরোগ—চিঠির উত্তর আসেনি

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত

১৯৫৪ সালে রাউল ফলেরিউ দুটো কাজ করেছিলেন। বন্ধু ফাদার বালেজ-এর অনুরোধে জানুয়ারি মাসের শেষ রবিবার সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম অ্যান্টি-লেপ্রসি ডে বা কুষ্ঠ-বিরোধী দিবস উদযাপন করেছিলেন আর দু-খানা চিঠি লিখেছিলেন। সেই থেকে ভারত বাদে সারা বিশ্বে ওই দিনটা বিশ্ব কুষ্ঠ-বিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হয়। আমাদের দেশে পালিত হয় শহিদ দিবসে অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি, গান্ধীজীর প্রয়াণ দিবস।

ফরাসি মানবতাবাদী, লেখক, সাংবাদিক, সংগঠক রাউল ওই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছিলেন যে দিনটি পালন হোক কুষ্ঠরোগীদের সুচিকিৎসা ও তাদের সামাজিক মর্যাদা আদায়ের দাবিতে।

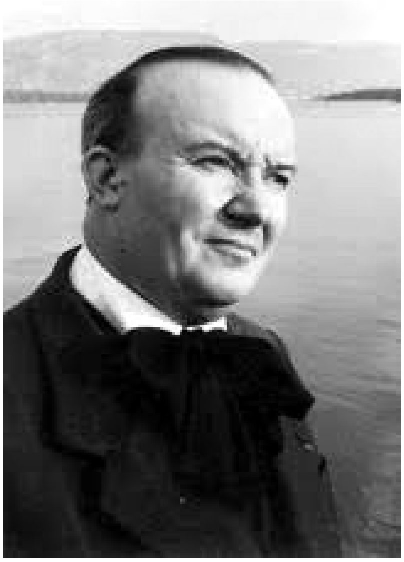

চিত্র ১. রাউল ফলেরিউ

ওই সালের পয়লা সেপ্টেম্বর রাউল দু-টি চিঠি লেখেন। প্রাপক ছিলেন জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও জর্জি ম্যালেনকভ, যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক (৭ তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নে চিঠিটা পান ম্যালেনকভের পদে আসীন নিকিতা ক্রুশ্চেভ)। চিঠি দু-টির বয়ান এক। উনি একটি স্পেশাল উপহার চাইছেন, একটি স্ট্র্যাটেজিক বোম্বার প্লেন-এর দাম।

“আমি আপনাদের কাছে যা চাইছি তা খুবই সামান্য . . . প্রায় কিছুই না . . . আপনারা প্রত্যেকে আমাকে একটা করে আপনাদের বোমারু প্লেন দিন। কারণ আমি শুনেছি যে ওগুলির এক-একটির দাম প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ফ্র্যাঙ্ক . . . হিসেব করে দেখেছি দুটো প্লেনের দামে আমরা সারা পৃথিবীর সমস্ত কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারব।”

রাউল মারা গেছেন ১৯৭৭ সালে। চিঠি লেখার পরে বেঁচেছিলেন আরও ২৩ বছর। চিঠি দুটোর একটারও উত্তর পাননি। সেটাই স্বাভাবিক। কোনো পাগলের প্রলাপ ভেবে হোয়াইট হাউস আর ক্রেমলিনের বাজে কাগজের ঝুড়িতে, আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল নিশ্চয়ই।

রাউলকে কিন্তু ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়নি। আজও সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে কুষ্ঠ বিরোধী দিবস। রাউলকে আর কুষ্ঠবিরোধী প্রচেষ্টাকে স্মরণ রেখে একজন সামান্য স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে, কুষ্ঠরোগের সম্পর্কে একটি লেখা দিলাম। যদি একটুও কাজে লাগে, দু-দশ জন জানলেও মনে হবে আমার শ্রম সার্থক হল।

কুষ্ঠ রোগ নিয়ে দু-চার কথা

১. যেকোনো মানুষের কি কুষ্ঠরোগ হতে পারে?

উ. না। আপনি কি কখনো দেখেছেন যে আপনার আশেপাশে প্রত্যেকটি মানুষের সব ধরনের রোগ হচ্ছে? সবার কি হাঁচিকাশি হচ্ছে অথবা নাক দিয়ে জল পড়ছে অথবা পাতলা পায়খানা হচ্ছে? কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরকম, সবাই কুষ্ঠরোগে ভোগেন না। এ থেকে বোঝা যায় যে বিভিন্ন রোগের মোকাবিলায় আমাদের শরীর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাড়া দেয়। কোনো রোগ বা সংক্রমণের মোকাবিলা করার এই ক্ষমতাকে সেই মানুষটির ‘রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা’ বলে।

২. শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কী?

উ. রোগ হওয়া আটকানোর জন্য জীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরের লড়াই করার ক্ষমতাকে “রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা” বলে। সংক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য আমাদের রক্তে বিশেষভাবে তৈরি কিছু কোশ আছে। এই কোশগুলোর মধ্যে ক্ষতিকারক জীবাণুদের চিনে নেওয়া, তাদের গিলে ফেলে হজম করা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। এই কোশগুলির ক্ষমতাবলে আমাদের শরীর কুষ্ঠরোগের জীবাণুসহ অধিকাংশ ক্ষতিকারক জীবাণুর বিরুদ্ধে অনেক সময়েই অপ্রতিরোধ্য।

৩. রোগের বিকাশ কীভাবে হয়?

উ. আমাদের শরীরে কোনো জীবাণু প্রবেশ করার পর সেটি নিজের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধির জন্য একটি পছন্দসই জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানে বাসা বাঁধার চেষ্টা করে। অন্যদিকে আমাদের শরীর জীবাণুর এই

বংশবৃদ্ধি, সংখ্যাবৃদ্ধি ও বিস্তারকে প্রতিরোধ করে রোগের বিকাশকে আটকানোর চেষ্টা করে। যদি শরীর জীবাণুকে মোকাবিলা করতে অক্ষম হয় তাহলে রোগের বিকাশ ঘটে।

৪. আমাদের প্রত্যেকের কেন সবধরণের রোগ হয় না?

উ. এটা হল কোনো মানুষের শরীরের কোনো একটি নির্দিষ্ট ধরনের জীবাণুকে চিহ্নিত করা ও তাকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা। বিভিন্ন মানুষের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কোশের একটি নির্দিষ্ট অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করার কমবেশি ক্ষমতা থাকে। যেমন যে মানুষটির শরীরে সাধারণ সর্দিকাশি রোগকে মোকাবিলা করার প্রচুর ক্ষমতা, সে সর্দিকাশিতে ভুগবে না। অন্যদিকে যার শরীরে এই সর্দিকাশির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নেই বা কম, সে সহজেই ওই রোগে ভুগবে।

৫. প্রত্যেকে কেন কুষ্ঠরোগে ভোগে না?

উ. সেই মানুষটির কুষ্ঠরোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতার ওপর এটি নির্ভর করে। গবেষণায় জানা গেছে যে আমাদের জনসংখ্যার ৯৫-৯৯ শতাংশ মানুষ কুষ্ঠ রোগের জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সক্ষম, বা এই জীবাণুর সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ কুষ্ঠ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে কেবলমাত্র ১-৫ শতাংশ মানুষ কুষ্ঠরোগে ভুগতে পারে।

৬. কুষ্ঠরোগ কেন হয়? কীভাবে এই রোগ দেহের ক্ষতি করে?

উ. কুষ্ঠ অন্য কোনো জীবাণুঘটিত রোগের মতো একটি রোগ। এই জীবাণুর নাম মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি। এই রোগে প্রধানত প্রান্তিক স্নায়ু, ত্বক ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ আক্রান্ত হয়। এবং যথাযথ চিকিৎসা না হলে অঙ্গ বৈকল্য ও অঙ্গ বিকৃতি হতে পারে।

৭. কুষ্ঠরোগে সংক্রামিত বা রোগে ভুগছেন এমন কোনো মানুষের সাথে কি আমি বসবাস করতে পারি?

উ. হ্যাঁ পারেন। কারণ কুষ্ঠ অতি সামান্য সংক্রামক। তবে রোগে ভুগছেন এমন মানুষের নিয়মিত এমডিটি ওষুধ খাওয়া বাধ্যতামূলক। এমডিটি শুরু করলে সংক্রামক ধরনের কুষ্ঠও কয়েকদিনের মধ্যেই অসংক্রামক হয়ে পড়ে।

৮. কোনো কুষ্ঠরোগীকে যদি আমি বিয়ে করি?

উ. কেন নয়? অন্য যেকোনো জুটির মতোই আপনার বিবাহিত জীবন স্বাভাবিক হবে। যদি কাউকে প্রয়োজনীয় মাত্রার এমডিটি দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তাহলে তিনি রোগমুক্ত ধরা যায়।

৯. কুষ্ঠরোগীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই রোগ হওয়ার ঝুঁকি আছে কি?

উ. কুষ্ঠ বংশগত নয়, শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর রোগ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে।

১০. বাড়িতে রেখে কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা করা যেতে পারে?

উ. হ্যাঁ। রোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করাই ভালো।

১১. সারাজীবনই কি চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে?

উ. না, রোগের ধরন অনুযায়ী মাত্র ছয় অথবা বারো মাস ওষুধ (এমডিটি) গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ওষুধ ও চিকিৎসা বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

১২. কুষ্ঠরোগের অঙ্গবিকৃতি কি ঠিক করা যায়?

উ. হ্যাঁ, চিকিৎসাপর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পুনর্গঠন-শল্য চিকিৎসা (রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারি) করে বহুক্ষেত্রে অঙ্গবিকৃতি ঠিক করা যায়। ফিজিয়োথেরাপিরও একটি বড়ো ভূমিকা আছে।* (সম্পাদকীয় বক্তব্য দেখুন।)

১৩. একজন কুষ্ঠরোগীকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত?

উ. কেন নয়? এই রোগটি যৎসামান্য সংক্রামক, এমডিটি বা বহু ওষুধ সমন্বিত চিকিৎসা দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। যক্ষ্মারোগের মতোই কুষ্ঠরোগ প্রধানত হাঁচিকাশির মাধ্যমে ছড়ায়। তিন মাত্রা এমডিটি খেলে একজন সংক্রামক রোগীর রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা চলে যায়, তিনি অসংক্রামক হয়ে পড়েন। যদি অনতিবিলম্বে রোগ নির্ণয় করা যায় এবং চিকিৎসা সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করা যায় তাহলে কোনোরকম অঙ্গবৈকল্য বা বিকৃতি হয় না।

১৪. কুষ্ঠ আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে কি কাজকর্মে নিয়োগ করা যাবে?

উ. হ্যাঁ, যদি ওই ব্যক্তি চিকিৎসা চালিয়ে যান অথবা ইতিমধ্যে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করে ফেলে থাকেন তাহলে সহনাগরিক/সহকর্মীদের সংক্রমণ হবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

১৫. কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য কী কী কেন্দ্র আছে?

উ. সারা ভারত জুড়ে বহু কেন্দ্র আছে যেখানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পাশপাশি অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত আছে।

১৬. অঙ্গবৈকল্য যুক্ত কুষ্ঠরোগী কি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা পেতে পারেন?

উ. হ্যাঁ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক-এর মাধ্যমে এই ধরনের সুযোগসুবিধা পাওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

১৭. চিকিৎসিত বা অচিকিৎসিত 'কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তি'-দের কী কী অধিকার আছে?

উ. এঁদের সবাইকে সমান অধিকারপ্রাপ্ত একজন স্বাভাবিক সহনাগরিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

১৮. কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক লক্ষণ কী? কাকে সম্ভাব্য/সন্দেহজনক বলব?

উ. চামড়ায় ফ্যাকাশে অসাড় দাগ এবং/অথবা চামড়া পুরু হয়ে যাওয়া এবং/অথবা তেলতেলে এবং/অথবা চকচকে ভাব এবং/অথবা গুটি; এবং/অথবা হাতে/পায়ে ঝিনঝিনে বা অসাড় ভাব এবং/অথবা ঠান্ডা বা গরম জিনিস টের না পাওয়া এবং/অথবা কোনো জিনিসকে হাত বা পায়ের আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে দুর্বলতা; এবং/অথবা চোখ বন্ধ করতে না পারা এবং/অথবা হাত বা পায়ের আঙুল বেঁকে

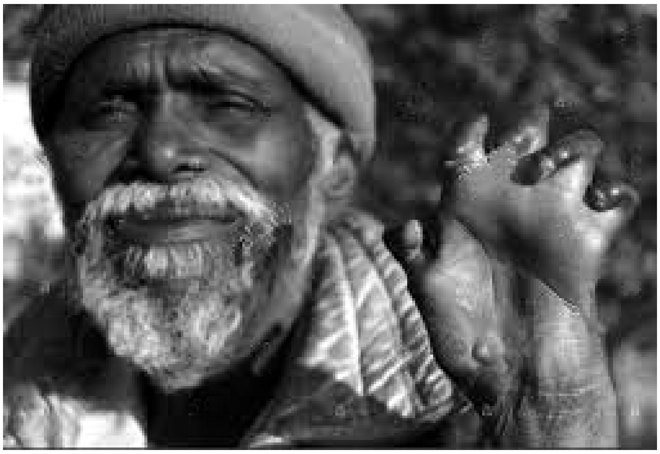

চিত্র ২. কুষ্ঠ রোগী—সময়ে চিকিৎসা হয়নি

যাওয়া এবং/অথবা হাতের তালু বা পায়ের তলায় ঘা এবং/অথবা অসাড় ভাব যুক্ত যেকোনো মানুষকে কুষ্ঠরোগী হিসেবে সন্দেহ করা হবে।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে লেখা রাউল-এর প্রথম কবিতার বইএর নাম ছিল Book of Love।

এক বুক ভরা ভালোবাসা রাউল-এর জন্য।

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, স্বাস্থ্য প্রশাসক।

সম্পাদকীয় বক্তব্য

* এ নিয়ে একটু বিশদে বলা দরকার, কেননা কিছু কিছু রোগীর ঘা থেকে যায়, আর তাঁদের দেখে জনগণ ধরে নেন, কুষ্ঠ সারে না।

কুষ্ঠরোগের জন্য হওয়া সামান্য অসাড়ভাব সাধারণত পুরোই সেরে যায়। কিন্তু অনেকটা জায়গা অসাড় হলে সেই অসাড়তা পুরো নাও সারতে পারে। এমনিতে এরকম অসাড় দাগ একটু সাদাটে বা লালচে হতে পারে, রোগীর তা নিয়ে মনোকষ্ট থাকতে পারে বা সেটা দেখতে খারাপ লাগতে পারে। তবে আসল বিপদ অন্যত্র। অসাড় জায়গা, বিশেষ করে সেটা যদি হাত-পায়ের আঙুল বা তালু হয়, সেখানে বারবার ছোটোখাটো আঘাত লাগতে পারে, বা রোগীর অজান্তে কেটে বা পুড়ে গিয়ে বড়ো ঘা হয়ে যেতে পারে। এতে ব্যথা থাকে না বলে অনেক রোগীই তেমন গা করেন না। ক্ষত ঘা ক্রমে গভীর হয়, সাধারণ চিকিৎসায় সারতে চায় না। তাতে হাড় পর্যন্ত জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে, ও হাত-পায়ের আঙুল, এমনকী পুরো হাত বা পা কেটে বাদ দিতে হতে পারে। অথচ সামান্য যত্ন নিলে, অসাড়ভাব সারা জীবন থাকলেও তাতে ঘা হয় না, এরকম দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। কুষ্ঠরোগীর শরীরে থাকা কুষ্ঠজীবাণু মেরে ফেললেও অসাড়ভাব বা কোনো কোনো অঙ্গের দুর্বলতা (যেমন হাতের আঙুলগুলি অকেজো হয়ে বেঁকে যাওয়া) নিজে থেকেই দূর হয় না, এটা বোঝা দরকার ও এরকম রোগীকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। এঁদের জন্য বিশেষ ধরনের কাজের ব্যবস্থা করাও চিকিৎসার অংশ বলে ভাবতে হবে। যেমন একজন মাঠে কাজ করা চাষির পায়ের তলা অসাড় হয়ে গেলে, তাঁর পায়ে ঘা হওয়া স্বাভাবিক, ও তা সারা মুশকিল। তাঁকে এমন কাজে নিয়োগ করতে হবে যাতে পায়ের ওপর বেশি চাপ না পড়ে ও পা পরিষ্কার রাখা যায়। সুখের বিষয় যে খুব অল্প কুষ্ঠরোগীর রোগ এতটা পর্যন্ত এগোয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

সম্পাদকমণ্ডলী, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*

Advt.

‘অনীক’ পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। ‘অনীক’-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

টুকরো খবর

স্কুলব্যাগের ওজন কি কমবে?

৫ অক্টোবর, ২০১৮-এ জারি করা এক নির্দেশে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে স্কুলে শিক্ষণীয় বিষয় ও স্কুলব্যাগের ওজন সম্পর্কে নির্দেশিকা তৈরি করতে বলেছে।

বলা হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে হোমওয়ার্ক দেওয়া উচিত নয়।

এনসিইআরটি-র নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভাষা ও গণিত ছাড়া অন্য বিষয় রাখা উচিত নয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ভাষা, গণিত ও পরিবেশ বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিষয় রাখা উচিত নয়।

বলা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের যেন স্কুলে অতিরিক্ত বই এবং অন্য সামগ্রী আনতে না হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্কুলব্যাগের ওজন দেড় কিলোগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে দুই থেকে তিন কিলোগ্রাম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে চার কিলোগ্রাম, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে সাড়ে চার কিলোগ্রাম এবং দশম শ্রেণিতে সর্বোচ্চ পাঁচ কিলোগ্রাম হওয়া উচিত স্কুলব্যাগের ওজন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন ভারী স্কুলব্যাগ বহনের ফলে ক্লান্তি আসে, মাংসপেশিতে মোচ হয়, কাঁধ গোল হয়ে এসে কুঁজো হয়ে যায়, মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক বক্রতা বিকৃত হয়ে যায়। ঘাড়ে ও কোমরে ব্যথা হয়। মাথা ব্যথা হয়। শিশু বেশি সময় মন দিয়ে কাজ করতে পারে না।

কোমরে হাড় ছোটো হয়ে আসে, হাড়ে যে ক্ষয় হয় তার ফলে পরবর্তী জীবনে স্পন্ডাইলোসিস দেখা যায়। হাড়ের যে অংশে বৃদ্ধির ফলে শিশু বাড়ে অতিরিক্ত ওজনে সেই অংশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

স্কুলজীবনের বারো-তেরো বছর, সপ্তাহে ছয় দিন, বছরে নয় মাস, ভারী ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাওয়া আবার সেই ব্যাগ বয়ে বাড়ি ফেরা—কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আমাদের শিশুদের আমরা যদি বুঝতাম, যদি বুঝতেন স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষ! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ : ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

শব্দহীন মর্মবেদনা

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত

২৫ জানুয়ারি ২০১৮ *দ্য হিন্দু* পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। ডার্মাটোলজিস্টদের কনফারেন্স-এ যোগদান করতে কোচিতে এসেছিলেন ২৬ বছর বয়সি এক ডাক্তার। নাম মমতা রাই। শহরের একটি ঘরে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আত্মহত্যা। পুলিশ খুঁজে পায় সুইসাইড নোট। তাতে ডা. রাই লিখে গেছিলেন যে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

মুখবন্ধ

মার্কিন মুলুকের আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের ২০১৮ সালের বার্ষিক সভায় যে প্রতিবেদন পেশ করা হয় তাতে দেখা গেছে যে ওই দেশে প্রতিদিন একজন করে ডাক্তার আত্মহত্যা করেন—প্রতি ১০০,০০০-এ ২৮ থেকে ৪০ জন। অর্থাৎ আজকের দিনটিতেও কোনো-না-কোনো ডাক্তার সুইসাইড করে মারা গেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে স্বচ্ছল ও অগ্রগামী দেশেই এই হাল, তাহলে আমাদের দেশে কী অবস্থা ভাবুন!

গত বছর দিল্লি এইমস-এর রেসিডেন্ট ডাক্তারদের অ্যাসোসিয়েশন ওই হাসপাতালের প্রশাসনের কাছে লিখিত আর্জি জানায় তাদের জন্য আলাদাভাবে কাউন্সিলর নিয়োগ করতে এবং চব্বিশ ঘণ্টার হেল্প লাইন খুলতে।

প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা

ওই প্রতিবেদনে আরও যেসব বেদনাদায়ক তথ্য উঠে এসেছে সেগুলি হল: ১. আত্মহত্যার এই হার সাধারণ জনসংখ্যার হার-এর দ্বিগুণেরও বেশি; এবং ৩. সামরিক বাহিনীর সদস্যদের চেয়েও বেশি; ৪. মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রচেষ্টার হার কম হলেও তাঁদের প্রচেষ্টায় সাফল্য-এর হার সাধারণ জনসংখ্যার আড়াই থেকে চার গুণ; ৫. শুধু উত্তর আমেরিকা নয়, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, চিন সব দেশেরই গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তার ও ডাক্তারি পড়ুয়াদের মধ্যে অবসাদ, আশঙ্কা ইত্যাদি অসুখের পরিমাণ ও সব মিলিয়ে আত্মহত্যার পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে চিকিৎসকদের মধ্যে আনুমানিক ১২% পুরুষ ও ১৯.৫% মহিলা ডিপ্রেশন-এ ভোগেন, ডাক্তারি পড়ুয়াদের মধ্যে এটা আরও বেশি। ডাক্তারি পড়ুয়া ও জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০%-এর ডিপ্রেশন খুঁজে পাওয়া গেছে। ১৬ জন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি ডাক্তার পিছু একজনের আত্মহত্যার ভাবনাচিন্তা দেখা গেছে।

চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত মানসিক রোগগুলি হল বিভিন্ন অ্যাফেক্টিভ ডিজ্অর্ডার যেমন ডিপ্রেশন, বাইপোলার ডিজ্অর্ডার, অ্যালকোহলিজম, অন্যান্য সাবস্ট্যান্স এবিউজ ডিজ্অর্ডার। আত্মহত্যার প্রচলিত পদ্ধতি হল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও ওষুধের ওভারডোজ (মার্কিন মুলুকে)। ভারতীয় জার্নাল অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধ অনুযায়ী ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কর্মরত নেশার সামগ্রী ব্যবহারের হার ১৪ থেকে ২৫%। অন্য ভাষায় বিভিন্ন ম্যাট্রিক্স ওয়ান ডিজ্অর্ডার।

কারণ

এই প্রবণতার কারণগুলো একবার খুঁজে দেখা যাক।

১. বার্ন্ট আউট বা ফুরিয়ে যাওয়া: প্রয়োজনীয় বিশ্রাম বিরতি ছাড়াই একটানা লাগাতার কাজের ফলে জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি হওয়া খুবই প্রচলিত। একই সাথে সিনিয়র ডাক্তারদের বছরের পর বছর ধরে প্রচণ্ড পেশাগত চাপের সামনে পড়তে হয়। দুটি ক্ষেত্রেই এর ফলে আবেগ নিঃশেষিত হয়ে অবসাদ তৈরি হয়।

২. মেডিক্যাল কলেজ: পূর্ণাঙ্গ ডাক্তার হওয়ার অনেকে আগেই মেডিক্যাল পড়ুয়াদের মধ্যে পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ সামলানোর জন্য

কিছু অস্বাস্থ্যকর অভ্যেস তৈরি হয় যার রেশ থেকে যায় পাস করে বেরোনোর পরেও।

মেডিক্যাল কলেজগুলো যে স্তরের পারদর্শিতা ও প্রবণতা দাবি করে সেটা মেটানো বহু পড়ুয়ার পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ে তা সে যতই মেধাবী হোক না কেন। এর ফলে একটা নড়বড়ে ঘা-খাওয়া আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা জন্ম নেয়। এই অবস্থাকে আরও খারাপ করে দেয় রাতদিন পড়াশোনা, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, বাড়ি ও বন্ধুবান্ধব-এর প্রত্যাশার ধকল ইত্যাদি; যার ফলে তৈরি হয় মানসিক ক্লান্তি।

৩. মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা গ্রহণের বাধাবিপত্তি: পরিহাস এটাই যে ডাক্তারি পেশাতে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্নামের ভয় প্রবলভাবে বিদ্যমান। সাধারণ মানুষের চেয়ে ডাক্তাররা নানা কারণে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে অনিচ্ছুক। বেশিরভাগ ডাক্তারই নিজের চিকিৎসা নিজে করব জাতীয় ছদ্ম-প্রত্যয়-এ ভোগেন, লজ্জা পান, বদনামের ভয় পান।

৩. সময়ের অভাব: রুগী দেখার পেশাদার জীবনের বাইরে যেটুকু মূল্যবান সময় বাঁচে সেটা পরিবারের জন্য খরচ করতেই চলে যায়, ব্যস্ত পেশাদার জীবন থেকে নিজের চিকিৎসার জন্য সময় বের করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ছুটিছাটা নেই আর পাঁচটা পেশাদারের মতো তার জীবনে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে সমাজ হিসেবে এইসব আত্মহত্যার ঘটনাগুলোতে আমরা কীভাবে সাড়া দিই। ওই পরিবারের অন্য জীবিত সদস্যদের কিছুদিনের জন্য ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়, যার পাশাপাশি চলে মৃত মানুষটির চরিত্রের কাঁটাছেঁড়া, যা চলতে থাকে বেশ কিছুদিন তার শারীরিক কাঁটাছেঁড়ার পরেও। পরিবারের সদস্যরা এক বিভ্রান্ত অবস্থায় নিজেদের শোক, দুঃখ, অনুতাপ, পাপ বোধ নিয়ে বেঁচে থাকে।

তারপর অখণ্ড নীরবতা। যতদিন না পর্যন্ত আবার কোনো ডাক্তারি পড়ুয়া বা ডাক্তার সুইসাইড করবেন ততদিন চলবে এই নিস্তব্ধতা। পাশাপাশি চলবে দুর্গাপুজোর বা ঈদের কেনাকাটা, ছুটিতে মানালি বা ব্যাংকক বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান, নতুন গাড়ির রং-বা কী হবে এই নিয়ে আলোচনা।

আবার হবে সুইসাইড। আমাদের সম্মিলিত রাগ আছড়ে পড়বে ফেসবুকের পাতায়। সব ভুলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব এটা নিশ্চিত করতে যে মৃত্যুর কারণ হিসেবে যা খুশি লেখা হোক, সুইসাইডটা যেন লেখা না হয়। কারণ সেটা বড়ো লজ্জার।

কারণ আমরা জেনে এসেছি সেই অমোঘ বাণী: "Medica, cura te ipsum"; ফিজিসিয়ান, হিল দাইসেলফ; চিকিৎসক, তুমি নিজেকে সরিয়ে তোল। যে ডাক্তার নিজেকে সারাতে পারে না সে আবার কেমন ডাক্তার!! অতএব চেপে যাও। গোপন করো।

এই সিক্রেসি, শেম আর সাইলেন্স-এর বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ রেখে এই সমস্যার সমাধান হবে না। আলোচনা হোক খোলাখুলি। সাধারণ মানুষ জানুক, বুঝুক যে আমরা, চিকিৎসকরা কোনো অসাধারণ মানুষ নই। আর পাঁচটা মানুষের মতো আমরাও দৈহিক, মানসিক আঘাত থেকে বিপন্ন, বিপর্যস্ত হই।

যতদিন না পর্যন্ত আবার কোনো ডাক্তারি পড়ুয়া বা ডাক্তার সুইসাইড করবেন ততদিন চলবে এই নিস্তব্ধতা।

উপসংহার

বিখ্যাত হিপোক্রেটিক শপথ বাক্যের নতুন রূপ জেনেভা বিবৃতির নবতম শিকাগো সংশোধন-সংযোজনটা আরেক বার মনে করি:

"I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard."

"আর্ত, পীড়িত মানুষকে সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা দিতে গেলে চিকিৎসককে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে।"

সমাজ, সরকার সেই কাজে ডাক্তারদের পাশে এসে দাঁড়ান।

(আমার এক স্নেহভাজন অনুজের অনুরোধে এই লেখা। সে নিজে অবসাদে ভুগছে তার কাজের জায়গার অমানুষিক চাপ ও কর্তৃপক্ষের অমানবিক ব্যবহারের জন্য। প্রশাসনিক জটিলতায় একমাসের মাইনে পায়নি। সে প্র্যাকটিস করে না। প্রতিমাসে কিস্তির জন্য দিতে হয় ৩০,০০০ টাকা। বাড়িতে স্ত্রী, ছোটো বাচ্চা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবা। তার নামটা গোপনই থাক।)

সূত্র ১: পলিন এন্ডারসন পাবমেড ২০১৮।

সূত্র ৩: ফিজিসিয়ান সুইসাইড; শ্রুতি ভেঙ্কটেশ, মাইন্ড ফাউন্ডেশন, ২০১৮। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, স্বাস্থ্য প্রশাসক।

এক আশ্চর্য আবিষ্কারের সুবর্ণ জয়ন্তী ও বাঙালি চিকিৎসক

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক

এবছর মানব সভ্যতার ইতিহাসের অন্যতম মহান আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে। যে আবিষ্কারে বেশ কিছু বাঙালি চিকিৎসকের অবদান ভোলার নয়। তবু আমরা ভুলে গেছি। একে বাঙালি, তার উপর আবার চিকিৎসক। তাই নিয়ে এত লাফালাফি করার কী আছে। না, মশাই, আবিষ্কারটা অ্যাটম বোম বা ওই টাইপের নয়। এ এক আশ্চর্য ম্যাজিক বুলেট। যা প্রাণ নেয় না, মরণাপন্নকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। গল্প মনে করে পড়ে ফেলুন না। কথা দিচ্ছি, ঠকবেন না।

আমি গল্প লিখি বটে, সত্যি গল্পই বেশি, তবে সেসবই প্রায় নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে। কিন্তু এটা সেরকম গল্প নয়। এটা আসলে কোনো গল্পই নয়। বেশ খেটেখুটে পড়াশুনো করে লেখা।

১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি। ঢাকার রাস্তা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কী ব্যাপার? কীসের জন্য এই নিরাপত্তার কড়াকড়ি? বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে রাষ্ট্রপ্রধানেরা ঢাকায় এসেছেন। এসেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা। আর এসেছেন সারা বিশ্বের নামকরা বৈজ্ঞানিক আর চিকিৎসকেরা। সকলেই এসেছেন এক বিশেষ সম্মেলনে যোগ দিতে।

কীসের জন্য এই সম্মেলন? পঁচিশ বছর আগে ঢাকা এবং কলকাতার একঝাঁক বাঙালি এবং আমেরিকানদের যৌথ প্রচেষ্টায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাসে এর সমতুল্য মানবিক আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা নব জীবন ফিরে পেয়েছে এই আবিষ্কারের ফলে। সেই মহান আবিষ্কারের রজত জয়ন্তী পালনের উপলক্ষে এই সম্মেলন।

আজও দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা এবং চিকিৎসকেরা এই আবিষ্কারের কথা উঠলেই শ্রদ্ধার সাথে বাঙালিদের অবদানের কথা স্মরণ করে। এই আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই এখনও জীবিত। অনেকেই কলকাতায়, ঢাকায় অথবা বাংলারই কোনো গ্রামে বা শহরে অবহেলাতে দিন কাটাচ্ছেন। এখনও নামকরা নানা বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁদের কাজ রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাঙালি তাঁদের ভুলে গেছে।

এই আবিষ্কারটি হল 'ওরাল রিহাইড্রেশান সল্ট' বা সংক্ষেপে ওআরএস। অসংখ্য কলেরা এবং অন্যান্য ডায়েরিয়া রোগীকে মৃত্যুর

চিত্র ১. ১৯৭১—উদ্বাস্তু ক্যাম্প

মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে এই অসাধারণ পানীয়। আবিষ্কারটি অসাধারণ হলেও এই পানীয় তৈরি করা কিন্তু অত্যন্ত সহজ। এক লিটার জলে ছয় চামচ চিনি আর অর্ধেক চামচ লবণ মেশালেই তৈরি 'হোম মেড ওআরএস'। হাসপাতালে যে ওআরএস পাওয়া যায়, তার ফর্মূলা প্রায় একই। এতে শুধু অতিরিক্ত মেশানো হয় পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর সোডিয়াম সাইট্রেট।

ওআরএস-এর ফর্মূলা এত সহজ হলেও এর আবিষ্কারের ইতিহাস কিন্তু মোটেই সহজ সরল নয়। এই ইতিহাস ঘাঁটলে চোখে পড়ে কীভাবে কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসাব তুচ্ছ করে, অর্থ অথবা খ্যাতির মোহ ত্যাগ করে মানুষের ভালোর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। আবার কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঈর্ষা, একগুঁয়েমি আর খ্যাতির মোহে জীবনদায়ী আবিষ্কারকেও কয়েক বছর পিছিয়ে দেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কলেরা এবং অন্যান্য ডায়েরিয়া রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। গবেষণা চলে প্রধাণত দু-টি রাস্তা ধরে। তখন রোগের জার্ম থিয়োরি জাঁকিয়ে বসেছে। নিত্য নতুন রোগের জীবাণু আবিষ্কার হচ্ছে। নানা রকম অ্যান্টিবায়োটিক বার হচ্ছে। প্রথম রাস্তার

বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন ডায়েরিয়ার কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল রোগের জীবাণু খুঁজে পেলে এবং তাকে ধ্বংসকারী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করতে পারলেই রোগকে নির্মূল করা যাবে। দ্বিতীয় রাস্তার বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ করেছিলেন ডায়েরিয়ার রোগীদের মৃত্যুর মূল কারণ শরীরের জলশূন্যতা। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন এমন কোনো তরল আবিষ্কার করতে যা শিরায় প্রবেশ করিয়ে রোগীর দেহে জলের অভাব পূরণ করা যায়। তখনও পর্যন্ত চিকিৎসকদের ধারণা ছিল কলেরা অথবা অন্যান্য ডায়েরিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পরিপাকনালী অর্থাৎ অন্ত্র ইত্যাদির এতটাই খারাপ অবস্থা হয় যে এসময় মুখে কিছু খাওয়ানো রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক।

১৯২০ সাল নাগাদ ডায়েরিয়ার চিকিৎসা হিসাবে শিরায় তরল চালানো প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে শুরু হয়ে গেল। সে সময় ডায়েরিয়া না কমা পর্যন্ত রোগীদের স্যালাইন চালিয়ে সম্পূর্ণ উপোস করিয়ে রাখা হত। এই চিকিৎসার ফলে মৃত্যুহার কিছুটা কমলেও সন্তোষজনকভাবে কমছিল না। কারণ অধিকাংশ ডায়েরিয়া আক্রান্ত রোগীর বয়স ছিল পাঁচ বছরের নীচে। তাদের পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত উপোস করিয়ে রাখার ফলে তারা ভয়াবহ অপুষ্টির শিকার হত। ডায়েরিয়া থেকে প্রাণে বাঁচলেও পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন রকম অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে মারা যেত। তাছাড়া এই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতেই হত, আর তাই তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও নিম্নবিত্তের নাগালের বাইরে। শিরায় যে তরল চালানো হত, তাও বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। এক-এক হাসপাতালে এক-এক রকম তরল চালানো হত। কয়েক জায়গায় ডায়েরিয়া রোগীদের রক্ত পর্যন্ত চালানো হত। যার ফলে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে মৃত্যুহার ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ।

১৯৪০ সালে ডাক্তার ড্যানিয়েল ডারো (Daniel Darrow) বিভিন্ন ডায়েরিয়া রোগীদের পায়খানায় জল ও নানা রকম ইলেক্ট্রোলাইটের পরিমাপ করে এক বিশেষ স্যালাইন প্রস্তুত করলেন। এই তরলে ছিল গ্লুকোজ, পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড। ডারো সাহেবের এই আবিষ্কারের পর হাসপাতালে ডায়েরিয়ায় মৃত্যু হার অনেকটাই কমানো গেল। তিনি প্রথম ডায়েরিয়ার ফলে দেহ অভ্যন্তরে জল ও অন্যান্য ইলেক্ট্রোলাইটের যে পরিবর্তন হয়, তা পরিমাপ করলেন। ফলে ডায়েরিয়ার চিকিৎসাও অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পরেও সারা বিশ্বে ডায়েরিয়ায় মৃত্যু হারের বিশেষ পরিবর্তন হল না। কারণ ডায়েরিয়ার মহামারী মুলত হত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয়। সেখানে না ছিল ডারো সাহেবের স্যালাইন চালানোর উপযুক্ত হাসপাতাল, না ছিল এই বিপুল সংখ্যক রোগীকে সামলানোর মতো প্রচুর চিকিৎসক অথবা দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী।

চিত্র ২. ঘরে তৈরি ওআরএস

এই সমস্যা ডারো সাহেবকেও ভাবিয়েছিল। তাঁর আবিষ্কৃত স্যালাইন ব্যবহারের ফলে হাসপাতালে ভর্তি ডায়েরিয়া রোগীদের মৃত্যুহার এক ধাক্কায় প্রায় পাঁচ শতাংশে নেমে এল বটে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পেলেন না। ডারো-ই তখন চিন্তা করেছিলেন মুখে খাওয়া যায় এমন এক তরলের কথা, যা দিয়ে হাসপাতালের বাইরেও রোগীদের খুব কম খরচে সারিয়ে তোলা যাবে। তিনি এই তরল আবিষ্কার করতে পারেননি। কারণ তিনিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ডায়েরিয়ায় পরিপাকনালীর কার্য-ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে মুখে কিছু খাওয়ালে দেহে তার শোষণ প্রায় হয়ই না।

১৯৫৩ সালে ফিসার ও পার্সন সাহেব (R. B. Fisher ও D. S. Parsons) ইঁদুরের 'অন্ত্রে গ্লুকোজের উপর নির্ভরশীল' সোডিয়াম ও জল শোষণের পদ্ধতি (Glucose, Sodium and Water Transport) আবিষ্কার করলেন। কিন্তু তাঁরা চিকিৎসক ছিলেন না এবং ডায়েরিয়ার চিকিৎসায় এই আবিষ্কারের যে বিশেষ ভূমিকা আছে সেটা তাঁরা বুঝতে পারেননি। এরপরে বিভিন্ন ব্যক্তি 'গ্লুকোজের উপর নির্ভরশীল সোডিয়াম পাম্প' নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। সোডিয়াম পাম্প মানে এমন একটা পদ্ধতি যাতে খাদ্যের সোডিয়াম পরিপাকনালীর কোশের মধ্যে দিয়ে রক্তে শোষিত হয়, আর তার সঙ্গে জলও শোষিত হয়। বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকেরা বুঝতে পারলেন ডায়েরিয়ায় শরীরে জলের অভাব পূরণ করতে হলে পানীয়ে উপযুক্ত পরিমাণে গ্লুকোজ ও লবণ মেশাতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ চিকিৎসক তখনও বিশ্বাস করতেন

ডায়েরিয়ায়, বিশেষ করে কলেরায় পরিপাকনালীর এই সোডিয়াম পাম্প সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে শুধুমাত্র পানীয়ের মাধ্যমে ডায়েরিয়ার চিকিৎসা নয়, শিরার মাধ্যমে সরাসরি শরীরে উপযুক্ত তরল ঢোকাতে হবে।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফিলিপিন্সে কলেরা মহামারির আকার নিল। ডাক্তার ফিলিপ্স্ (Robert A. Phillips) ম্যানিলা হাসপাতালে Naval Medical Research Unit-এর প্রধান হিসাবে যোগ দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মুখে খাবার বিশেষ পানীয়ের মাধ্যমে কলেরার চিকিৎসা করা সম্ভব। তিনি গ্লুকোজ ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণ পান করিয়ে কয়েকজন কলেরা রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি দেখান পানীয়ে গ্লুকোজ মেশানোর ফলে দেহে সোডিয়াম ও জল শোষণের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে।

এরপরে আরও বড়ো মাত্রায় তিনি এই পরীক্ষা করতে উদ্যত হন। কিন্তু এবারে ভাগ্য তাঁর সহায় হল না। বেশ কয়েকজন কলেরা রোগীর মৃত্যুর পরে তিনি পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হন। পানীয়ে গ্লুকোজ ও লবণের মাত্রা সঠিক না হওয়ার জন্য এই বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু ডাক্তার ফিলিপ্স তাঁর ব্যর্থতার মূল কারণ বুঝতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত ভেঙে পড়েন। নিজের মতামত থেকে একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে একটি বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় কলেরার সময় খাদ্যনালীর ক্ষমতা কমে এই মর্মে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন কলেরা রোগীদের একমাত্র চিকিৎসা শিরার মাধ্যমে দেহে সরাসরি স্যালাইন দেওয়া। মুখে পানীয় খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত অন্তত দিন তিনেক পরে, যখন খাদ্যনালী অনেকটা সাম্য-অবস্থায় ফিরে আসে। তার আগে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

ওদিকে তখন বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান) এবং পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ অবস্থা। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে কলেরায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা মারা পড়ছে। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা তো দূরের কথা কারও কলেরা হলে অন্যরা তার ধারেকাছে ঘেঁষত না। কলেরা রোগী মারা যাওয়ার পরে তার অন্ত্যেষ্টি কাজের জন্য লোক পাওয়া যেত না।

১৯৬০ সালে ঢাকায় Pakistan-SEATO Cholera Research Laboratory প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ বিদেশ থেকে অনেক বিখ্যাত চিকিৎসক এখানে কাজ করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার গ্রিনাউ (Greenough), ডাক্তার হির্স্কর্ন (Hirschhorn), ডাক্তার ডেভিড সাচার (David B. Sachar) প্রমুখ।

প্রায় একই সময়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় The John Hopkins Center for Medical Research and Training। সেখানেও জোরকদমে চলছিল কলেরা নিয়ে গবেষণার কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই দু-জায়গার চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন শুধু মাত্র হাসপাতালে ভর্তি করে স্যালাইন চালিয়ে কলেরা রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কারণ পদ্ধতিটি যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ, এবং লক্ষ লক্ষ কলেরা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করার পরিকাঠামো অনুন্নত দেশগুলিতে নেই। অতএব বিকল্প কোনো সহজ চিকিৎসা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কলেরা রোগ নির্মূল করা সম্ভব নয়।

এই সময় সাচার সাহেব এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন। তিনি এবং তাঁর বাঙালি সহযোগী চিকিৎসকেরা হাতে কলমে প্রমাণ করেন কলেরা রোগীদের খাদ্যনালীর গ্লুকোজ সোডিয়াম পাম্প নষ্ট হয় না এবং কলেরা রোগীদের মুখে খাইয়ে তাদের জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন ঠিক করা সম্ভব। কলকাতার চিকিৎসকেরাও একই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। ফলে এতদিনের চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা মিথ ভাঙার উপক্রম হয়। চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন মুখে খাইয়েও কলেরা রোগীর চিকিৎসা সম্ভব।

কিন্তু কিছু বিদেশি চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকেরা এই সত্য হজম করতে পারছিলেন না। তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন দুই দেশের বাঙালিরা এই অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হবে সেটা তাঁদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। ফলে ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট বা ওআরএস এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর অনুমতি কলকাতায় বা ঢাকায় পাওয়া গেল না।

চট্টগ্রামে সেসময় কলেরার মহামারি চলছে। নলিন এবং ক্যাশ (Richard Cash and David Nalin) নামে দু-জন তরুণ আমেরিকান বৈজ্ঞানিক সে সময় চট্টগ্রামে যান। রফিকুল ইসলাম নামে এক স্থানীয় ডাক্তার 'ইসলাম প্রোটোকল' নামে ওআরএস-এর সাহায্যে কলেরা রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য একটি প্রটোকল তৈরি করেন। নলিন এবং ক্যাশ চট্টগ্রামে গিয়ে রফিকুল ইসলামের সাথে যোগ দেন। তাঁরাও বহু মানুষকে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু 'ইসলাম প্রটোকল'-কে পশ্চিমি চিকিৎসকেরা মান্যতা দেয় না। কারণ হিসাবে দেখানো হয় 'পুওর ডকুমেন্টশন', অর্থাৎ রোগীরা যে এই চিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়েছেন, এমন নথিপত্রের অভাব। আসলে তাঁরা এক অখ্যাত অচেনা বাঙালি তরুণ চিকিৎসককে এত বড়ো আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিতে চাননি।

চট্টগ্রামের চাঁদপুর জেলার 'মতলব' হাসপাতালে মিজনুর রহমান নামে এক বাঙালি ডাক্তার ওআরএস দিয়ে কলেরা রোগীদের চিকিৎসার অনুমতি চান। কারণ সেই হাসপাতালের পরিকাঠামো ছিল খুবই দুর্বল। বিদ্যুৎ ছিল না। দক্ষ কর্মীর সংখ্যাও ছিল কম। ফলে লক্ষ লক্ষ রোগীকে ভর্তি করে স্যালাইন চালানো ছিল সাধ্যের বাইরে। যথারীতি এই ফিল্ড ট্রায়ালের অনুমতি দিতে বিদেশি বৈজ্ঞানিকেরা গড়িমসি করছিলেন। মিজানুর তখন অনুমতি ছাড়াই ওআরএস দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। অসংখ্য মৃতপ্রায় রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। বাঙালি এই দেশপ্রেমিক চিকিৎসকদের খ্যাতির মোহও ছিল না। অর্থের লোভও ছিল না।

মিজানুরকে একবার নলিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ফিল্ড ট্রায়ালের অনুমতি ছাড়া ওআরএস ব্যবহার করে আপনি কি অনৈতিক কাজ করছেন না?' মিজানুর উত্তর দিয়েছিলেন, 'কোনটা অনৈতিক? অমৃত

হাতে পেয়েও তা ব্যবহারের অনুমতি নেই বলে চুপচাপ বসে শিশুদের মৃত্যু মিছিল দেখা, নাকি অনুমতির তোয়াক্কা না করে সেই অমৃত দিয়ে শিশুদের বাঁচিয়ে তোলা!'

'কিন্তু আপনার এই অসাধারণ কাজ কোনোদিনও স্বীকৃতি পাবে না ডাক্তার!'

'প্রতি মুহূর্তে আমার কাজ স্বীকৃতি পাচ্ছে নলিন। সন্তান ফেরত পাওয়া মায়ের হাসি, স্বামী ফিরে পাওয়া বধূর আনন্দ অশ্রু, বন্ধুকে ফিরে পেয়ে বন্ধুর উল্লাস আমার কাজের স্বীকৃতি। এর চেয়ে বড়ো পুরস্কারের প্রত্যাশা আমি করি না।'

নলিন ও ক্যাশ বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালিদের তৈরি প্রোটোকল সহজে ছাড়পত্র পাবে না। সেজন্য তাঁরা বাঙালি চিকিৎসকদের নাম বাদ দিয়েই আর একটি প্রটোকল তৈরি করেন। কিন্তু এবার বাদ সাধলেন ডাক্তার ফিলিপ্স, সেই যিনি ফিলিপিন্সে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সেসময় এথিকাল কমিটিতে। শেষ পর্যন্ত ঢাকা কলেরা রিসার্চ ল্যাবোরেটরির প্রধান ডাক্তার হেনরি মসলে (Henry Mosley)-এর সহযোগিতায় তাঁদের প্রোটোকল ছাড়পত্র পায়। তাঁদের এই ফিল্ড ট্রায়াল সফল হয়। *ল্যান্সেট* বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁদের কাজ প্রকাশিত হয়। প্রমাণিত হয় শুধু মাত্র ওআরএস-এর সাহায্যে শিরায় স্যালাইন না চালিয়েও এবং রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি না করেও কলেরার মৃত্যুহার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কয়েক কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে চলে এসেছিলেন। তাঁরা খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতেন। এই শিবিরগুলিতে কলেরা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ কলেরায় মারা যাচ্ছিলেন। তখন এই ওআরএস-এর সাহায্যেই অনেক মূল্যবান প্রাণ রক্ষা পায়। সেই সময় কলকাতার এক ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশ বনগাঁ উদ্বাস্তু শিবিরে কলেরা রোগীদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছিল। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে স্যালাইন চালানোর মতো পরিকাঠামো সেই উদ্বাস্তু শিবিরে ছিল না। ডাক্তার মহলানবিশ এবং তাঁর সহযোগীরা ঘরে তৈরি ওআরএস-এর সাহায্যে বেশিরভাগ রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। ডাক্তার মহলানবিশ ওআরএস-এর ফর্মুলায় কিছু পরিবর্তন করেন। যার ফলে এটি আরও কার্যকরী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি এজন্য আন্তর্জাতিক মহল থেকে অনেক পুরস্কারও পান। তার মধ্যে ২০০২ সালের পলিন (Pollin prize) পুরস্কার অন্যতম। নলিন ও ক্যাশের কাজের সাথে ডাক্তার মহলানবিশের কাজের মূল পার্থক্য ছিল, নলিন ও ক্যাশ দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে ওআরএস রোগীদের খাইয়েছেন এবং প্রতিটি কেস সুন্দরভাবে নথিভুক্ত করেছেন। অন্যদিকে ডাক্তার মহলানবিশ দক্ষ কর্মচারীদের সাহায্য পাননি। তিনি রোগীর বাড়ির লোককেই ওআরএস-এর ব্যবহার

চিত্র ৩. ওআরএস খাওয়ানো

শিখিয়েছেন। তিনি অনেক কম সংখ্যক কর্মীর মাধ্যমে প্রচুর রোগীর চিকিৎসা করে তাঁদের সুস্থ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন ইমারজেন্সির সময়ে ওআরএস কলেরা ও অন্যান্য ডায়েরিয়া থেকে মৃত্যু হার অনেক কমিয়ে দিতে পারে।

ডা. মহলানবিশ বর্তমানে কলকাতায় তার স্ত্রী ডা. জয়ন্তী মহলানবিশের সাথে বসবাস করেন।

১৯৭০ সাল থেকে ইউনিসেফ এবং ডব্লিউএইচও ওআরএস তৈরি করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নিখরচায় সরবরাহ করতে শুরু করে। যার ফলে আস্তে আস্তে কলেরা ও অন্যন্য ডায়েরিয়া রোগে মৃত্যু হার কমে আসে।

ইতিহাস ঘাঁটতে বসে আরও অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে। যেমন ১৯৫৩ সালে *ল্যান্সেট* পত্রিকায় কলকাতার এক ডাক্তার হেমেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী-র একটি লেখা প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে জানা যায় তিনি নিজের তৈরি ওআরএস ব্যবহার করে ১৮৬ জন কলেরা রোগীর চিকিৎসা করেন এবং সকলকেই সুস্থ করে তোলেন। তাঁর তৈরি ওআরএস-এর ফর্মুলা এবং পনেরো বছর বাদে নলিন ও ক্যাশের তৈরি ওআরএস-এর ফর্মুলা প্রায় একই। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই চ্যাটার্জীর কাজ স্বীকৃতি পায়নি। পশ্চিমি চিকিৎসকেরা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের নিয়মকানুন মানা হয়নি এই অজুহাতে তাঁর কাজকে স্বীকৃতি দেননি।

কে জানে ওআরএস আবিষ্কারের পেছনে এরকম আরও কত ইতিহাস অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে?

তথ্য সূত্র: *Magic Bullet: The History of Oral Rehydration Therapy* by Joshua Nalibow Ruxin. স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

জীবন কথা: ডা. দিলীপ মহলানবিশ

ডা. পুণ্যব্রত গুণ ও পিয়ালী দে বিশ্বাস

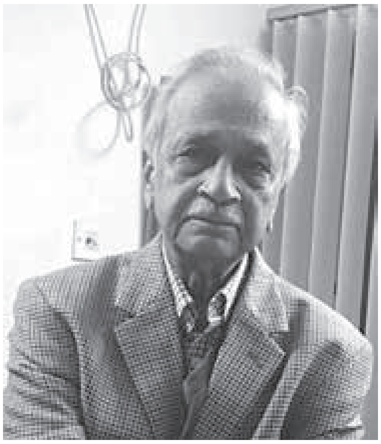

ডা. দিলীপ মহলানবিশ। জন্ম ১৯৩৪-এর ১২ নভেম্বর, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। দেশভাগের অল্প কয়েক বছর আগে কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। হেয়ার স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন করার পর ইন্টারমিডিয়েট পড়েন বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে। মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পাঠক্রমে ভর্তি হন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে, মেডিক্যাল কলেজ ছাড়েন ১৯৫৮-তে। শিশুরোগবিদ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। কয়েক বছর গবেষণার কাজ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথে।

৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ৯০ দশকের শুরু অবধি তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডায়ারিয়াল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে কর্মরত ছিলেন। তারপর বাংলাদেশে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়ারিয়াল ডিজিজ রিসার্চে ক্লিনিক্যাল রিসার্চের ডিরেক্টর ছিলেন তিনি।

১৯৯৪-এ তিনি রয়্যাল সুইডিশ আকাদেমি অফ সায়েন্সেস-এর সদস্য নির্বাচিত হন।

ওরাল ডিহাইড্রেশন থেরাপি অর্থাৎ মুখে খাইয়ে শরীরে জলের অভাব পূরণ করে কলেরার চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা চলছিল ১৯৪০-এর দশক থেকেই। ’৬০-এর দশকের শেষার্ধে কলকাতা ও পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় একই সঙ্গে ওআরএস বিকশিত হয়। শিরায় তরল দিয়ে জলের অভাব দূর করার মতোই কার্যকারিতা দেখায় ওআরএস। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা ভয় দেখাতে থাকেন, তাদের বক্তব্য ওআরএস-এর ব্যবহার খুব সাবধানে করা উচিত, অনভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে ওআরএস চিকিৎসা ছাড়া উচিত নয়।

এরপর কলকাতার আইডি হাসপাতাল সংলগ্ন জন হপকিন্স সেন্টার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এ কর্মী হিসেবে যোগ দেন।

ওআরএস আবিষ্কার ও চিকিৎসায় তার প্রয়োগের জন্য আর তিন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর সঙ্গে ২০০২-এ তিনি শিশুরোগ গবেষণায় প্রথম পলিন পুরস্কার পান। ২০০৬-এ পান প্রিন্স মাহিডোল পুরস্কার।

দেশে ফিরে পুল অফিসার হিসেবে কিছু দিন কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে কাজ করেন। সেখানে মূলত শিশুরোগ চিকিৎসার কাজ করলেও পাশাপাশি ডায়েরিয়া নিয়ে গবেষণার কাজ করার জন্য এক ল্যাবরেটরি গঠন করেন।

ল্যান্সেট বলেছিল ওআরএস গত শতাব্দীর সেরা ডাক্তারি আবিষ্কার। না কোনো র‍্যান্ডমাইজড ডব্‌ল ব্লাইন্ড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা কোনো আধুনিক আণবিক জীববিদ্যার গবেষণা নয়, যুদ্ধ-দুর্গতদের মধ্যে ব্যাপক কলেরার মহামারীর জরুরি চিকিৎসা করতে গিয়ে ওআরএসের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছিল।

তাই ১৯৭০-এ কলেরা যখন মহামারি রূপে অনেকগুলো দেশে একসঙ্গে আক্রমণ করে, তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রচুর পরিমাণে শিরায় চালানোর স্যালাইন পাঠিয়ে সংকট মোকাবিলার চেষ্টা করে। স্যালাইন পরিবহণ ব্যয়বহুল আর স্যালাইন চালানোর জন্য দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন।

সীমান্তের কাছে বনগাঁর শিবিরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন ডা. দিলীপ মহলানবিশ। কলকাতার জনস হপকিন্স সেন্টার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর কর্মী হিসেবে ওআরএস বিকাশের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি।

ডা. দিলীপ মহলানবিশের হাত ধরে ওআরএস-এর প্রযুক্তি উলটো পথে হেঁটেছে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী শরণার্থীদের শিবির থেকে ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে।

বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মীরা ওআরএস দেবেন, কিন্তু শরণার্থী শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীরও তো আকাল। তাই বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ না মেনে ওআরএস খাওয়ানো হতে লাগল মা-বাবা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধবদের কাজে

লাগিয়ে। ড্রামে ওআরএস গোলা থাকত, তা থেকে কাপে করে নিয়ে রোগীদের খাওয়াতেন তারা। যে ক-জন স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন তাঁদের দায়িত্ব ছিল ড্রাম ফুরোলেই ভরে দেওয়া আর মাঝেমাঝে দ্রুত রোগীদের দেখে নেওয়া। যে কেন্দ্রগুলোতে কেবল শিরায় স্যালাইন চালিয়ে জলশূন্যতার চিকিৎসা হত, সেখানে মৃত্যুর হার যখন ২০-৩০%, তখন ডা. মহলানবিশের ক্যাম্পে মৃত্যুর হার ছিল মোটামুটি ৩%।

অল্প কিছুদিন পরে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তু। পানীয় জলের অভাব, অপর্যাপ্ত মলমূত্র নিকাশির ব্যবস্থার ফলে বড়ো মাপের কলেরা মহামারি দেখা দেয় শিবিরগুলিতে।

সে সময় চিকিৎসকরা বা শিশুরোগবিদরা কিন্তু ওআরএসের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল যখন শিরায় দেওয়ার স্যালাইন পাওয়া যাচ্ছে না কেবল তখনই ওআরএস ব্যবহার করা উচিত। এবং ওআরএস স্যালাইনের ভালো বিকল্পও নয়। ডা. মহলানবিশের গবেষণাপত্র অনেকগুলো মেডিক্যাল জার্নাল বাতিল করে দেয়।

সে সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ব্যাকটিরিয়াল ডিজ়িজেস ইউনিটের প্রধান ছিলেন ডা. ধীমান বড়ুয়া। তিনি ডা. মহলানবিশের ক্যাম্প পরিদর্শন করে ওআরএস চিকিৎসার প্রভূত সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন। ডা. বড়ুয়া কলেরার পাশাপাশি শিশুদের ডায়েরিয়ার চিকিৎসায় ওআরএস ব্যবহারের পক্ষে প্রচার করতে থাকেন।

বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ জলের অভাব দূর করতে শিরায় স্যালাইন দেওয়া। কিন্তু স্যালাইনের সরবরাহ অপ্রতুল। তাই তিনি যেসব রোগীর শিরায় স্যালাইন জরুরি ভিত্তিতে দিতেই হবে তাঁদের ছাড়া সব কলেরা রোগীকে ওআরএস দিতে থাকলেন।

কিন্তু কিছু গবেষক লেগে পড়ে থাকেন। তাঁরা জনসমুদায়ে ছোটোদের ডায়েরিয়ায় ওআরএস-এর কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা চালাতে থাকেন। এই গবেষণা প্রকল্পগুলোর সাফল্য এবং ডা. বড়ুয়ার চাপে ১৯৭৮-এ সৃষ্টি হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডায়েরিয়াল ডিজ়িজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের।

৫০ লক্ষের বদলে সারা পৃথিবীতে ২০ বছর পর প্রতি বছর মারা যায় ১৮ লক্ষ ৫ বছরের কমবয়সি শিশু।

সেই সময় সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ ৫ বছরের কম বয়সি শিশু ডায়েরিয়ায় মারা যেত, শিশুরোগ বিভাগের শয্যার একটা বড়ো অংশ ভর্তি থাকত সেই সব শিশুদের দিয়ে জলশূন্যতা পূরণ করার জন্য যাদের স্যালাইন চলছে।

ডায়েরিয়াল ডিজ়িজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার ২০ বছর পর দেখা যায়, উন্নত আর উন্নয়নশীল দুই ধরনের দেশেই ওআরএস চিকিৎসা স্বীকৃত। শিরায় স্যালাইন চালানোর জন্য রেফারেল হাসপাতালগুলোতে আর বড়ো ওয়ার্ড লাগে না। জায়গা, সময় আর অর্থ এখন কাজে লাগানো যায় গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার কাজে।

জলে নুন আর চিনি মিশিয়ে ওআরএসের সরল চিকিৎসার পরীক্ষাগার ছিল এক উন্নয়নশীল দেশের শরণার্থী শিবির। প্রযুক্তি সাধারণত উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশে আসে। ডা. দিলীপ মহলানবিশের হাত ধরে ওআরএস-এর প্রযুক্তি উলটো পথে হেঁটেছে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী শরণার্থীদের শিবির থেকে ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে।

ডা. মহলানবিশকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও
পিয়ালী দে বিশ্বাস একজন সাংবাদিক।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই

অভিজিৎ মিত্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটি

বিশ্বজিৎ মিত্র

শুরুর কথা

চরম হতাশায় আত্মীয়পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনের শেষ ক-টা বছর কাটিয়ে ২৯শে এপ্রিল, ২০১৬-য় মাত্র ৫৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন অভিজিৎ মিত্র, অবসান ঘটে এক সম্ভাবনাপুর্ণ জীবনের। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তাঁর পরিবার ও বন্ধুজনেরা একসাথে বসে তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে স্বাস্থ্য নিয়ে কাজের কথা ভাবতে শুরু করেন। এরপর কিছু চিন্তাশীল মানুষকে সাথে নিয়ে নানা মত বিনিময়ের পর ১৬ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে সরকারি নথিভুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু করে অভিজিৎ মিত্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটি।

অ্যাম্বুলেন্স ও ২৪ ঘণ্টা অক্সিজেন পরিষেবার পর মনের অসুখ ও প্রাথমিক চিকিৎসাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল মাত্র তিনজন ডাক্তারবাবু ও কিছু স্বাস্থ্যকর্মী নিয়ে। দোতলা বাড়ির গোটা একতলা জুড়ে থাকা ব্যাগের কারখানা তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ তলাটা সোসাইটির হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাড়ির মালিক। ক্রমে ক্রমে অনেক শুভানুধ্যায়ীর সাহায্যে ও চেষ্টায় চালু হল কান-নাক-গলা, চর্ম, হাড়, চোখ, হার্ট, শিশু চিকিৎসা, শিশু মনোবিকাশ, স্ত্রীরোগ ইত্যাদি বিভাগ। সাথে চলল আমাদের সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে কর্পোরেট হাসপাতাল থেকে নিঃস্ব হয়ে ফেরা বিভিন্ন রোগীকে বাড়িতে রেখে কম খরচে সুস্থ করে তলার প্রচেষ্টা। এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি এই পরিকাঠামো গড়তে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা ডা. পুণ্যব্রত গুণ ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী ডা. সুমিত দাশ। বহু ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়ে গঠিত শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ব্যাপ্তি ও বিশালত্ব এ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তাঁর তুলনায় আমাদের প্রচেষ্টা নিতান্তই ক্ষুদ্র। সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেবার ভাবনা থেকে গড়ে ওঠা অভিজিৎ মিত্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটিতে বর্তমান ২৩ জন ডাক্তার ও বেশ কিছু সচেতন মানুষ যুক্ত থেকে একে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

আমরা কী করি?

জন্মলগ্নেই আমরা সোসাইটির পথচলার সুর বেঁধে দিয়েছি। স্বল্পমূল্যে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা, কম খরচে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা করানো, সঠিক মূল্যে অব্যাবসায়িক ওষুধের মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে আধুনিক চিকিৎসা—এগুলিই আমাদের সংস্থার মূলমন্ত্র।

আমাদের প্রতীকচিহ্নে লেখা Health For All—Tension Free Life For All হল আমাদের পথনির্দেশিকা। এরই অনুকরণে আমাদের নিজস্ব স্লোগান—চাপমুক্ত মন ও রোগমুক্ত শরীর। সোসাইটির দেওয়াল জুড়ে ছোটো ছোটো পোস্টারে আমাদের যুক্তিবাদী বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, যেমন—কাফ সিরাপে কাশি সারে না, টনিক খেলে শক্তি বাড়ে না, জেনেরিক ওষুধ, ব্র্যান্ডেড ওষুধের সমান কার্যকারী ইত্যাদি। দাবি করেছি, পৃথিবীর ৪১ টা দেশ তাদের নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিলে আমাদের দেশ কেন তা নেবে না?

ভারতে ৪৫০ জন মানুষ প্রতি ১টা এনজিও, যাদের সুবিশাল অংশ জনস্বাস্থ্য বিষয়ে উদাসীন। শুধু উন্নত দেশের সঙ্গে নয়, পড়শি দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে স্বাস্থ্যসূচকে ভারতবর্ষের নিম্নগামী অবস্থান প্রমাণ করে এনজিও দিয়ে কোনো দেশের স্বাস্থ্য বা চিকিৎসার মান উন্নত করা যায় না। স্বাধীনতার ৭২ বছরে পরেও দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র ১ শতাংশের কাছাকাছি ব্যয় হয় স্বাস্থ্যখাতে। এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমপরিমাণ উদাসীনতার ফলস্বরূপ সরকারি হাসপাতালে ঠাঁই না পেয়ে 'ফেলো কড়ি মাখ তেল' নীতিতে চলা বেসরকারি হাসপাতালের ফাঁদে পড়ে অসংখ্য মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন প্রতিদিন। অথচ সবার জন্য স্বাস্থ্য—এই দাবিতে আয়োজিত আমাদের প্রতিটি বাৎসরিক পদযাত্রায় সাধারণ মানুষের ঢল নামে না, সেখানে শামিল হন কিছু ডাক্তার ছাড়া মাত্র ১৫০ থেকে ২৫০ জন মানুষ। বিষয়টি আমাদের যুগপৎভাবে বিস্মিত ও চিন্তিত করে। ভেবে পাই না, সময়াভাবে, না ক্ষমতাশালীদের নজর এড়ানোর জন্য ন্যায্য দাবিতে পথে নামতে মানুষের এই অনীহা।

তবে আশার আলো এই যে ধীরে ধীরে হলেও মানুষ আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। ফলে মাত্র আড়াই বছরে তিনটে স্বাস্থ্যশিবির ছাড়াও শুধু ক্লিনিকেই আমরা প্রায় ১৭ হাজার রোগীকে পরিষেবা দিতে

পেরেছি। রোগীদের পরিবারের সাথে আমাদের আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছে সেই সুবাদে। মাত্র ৩০ টাকা দিয়ে নাম লিখিয়ে যেকোনো ডাক্তারকে দেখানো যায় এখানে। ইসিজি আর ফিজিয়োথেরাপি প্রতিটি করা হয় মাত্র ৫০ টাকায় । এছাড়াও অত্যন্ত কম দামে পাওয়া যায় প্রায় সব রকমের উচ্চমানের জেনেরিক ওযুধ। বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার মাধ্যমে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ ছাড়ে রক্তপরীক্ষা ও এক্স-রে ইত্যাদি পরিষেবা দেয় সোসাইটি। অবশ্য আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্তি অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা আজও পৌঁছে দিতে পারিনি প্রয়োজন মতো কর্মী ও ডাক্তারের অভাবে। তবে আশার কথা, আমাদের আন্তরিকতায় বহু বস্তিবাসী মানুষ আমাদের ক্লিনিকে পরিষেবা পেয়ে রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

শুধু স্বাস্থ্য পরিষেবাই নয়, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে জরুরিভিত্তিক কর্তব্যের ওপর আমরা কয়েকটি সচেতনতা শিবির করেছি সোসাইটি ভবনে। যেমন আচমকা গলায় কিছু আটকে গেলে কী করণীয় (হেমলিক ম্যানুভার), হঠাৎ কেউ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে কী করতে হবে (সিপিআর—কার্ডিয়ো-পালমোনারি রিসাসিটেশন), মহিলাদের স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে কী করা উচিত, সাপে কামড়ানোর প্রাথমিক চিকিৎসা কী, কীভাবে নিজেকে সুস্থ রাখবেন—এই সকল বিষয়ে কিছু ডাক্তার ও সমাজকর্মীর সহায়তায় বহু মানুষের উপস্থিতিতে এই সকল শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুধু আমরা নয়, আপামর দেশবাসী আশা করেন ও স্বপ্ন দেখেন যে ১৯৭৮ সালে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো সরকার একদিন নিশ্চয় দেশের সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেবে। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, বিনয়-বাদল-দীনেশ, নেতাজি প্রমুখ, যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, শ্রমিক আন্দোলনের শহিদ শংকর গুহনিয়োগী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে প্রতিটি দেশবাসী হবে দেহে-মনে সুস্থ ও সবল, তা কি বিফল হবে? আমরা সবাই যদি এ বিষয়ে সচেতন হই ও এই দাবিতে সোচ্চার হই, তবে অবশ্যই একদিন সেই স্বপ্ন পূরণ হবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই লক্ষ্যেই আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে যেটুকু পারি সেটুকু কাজ করার তাগিদে সোসাইটিতে আমরা যুক্ত হয়েছি ডাক্তারদের সাথে। প্রতিদিনের জমা থেকে খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থে পাঁচজন স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় আমরা এগিয়েছি অনেকটাই। এক-শো শতাংশ যুক্তিসম্মত চিকিৎসা আমরা দিতে পারছি এমন দাবি আমরা করি না, তবে আন্তরিকতা দিয়ে সেই ফাঁকটুকু ভরাটের চেষ্টা ক্রমাগত করে চলেছি। নাম নথিভুক্তির সময় আমরা রোগীর পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপচারিতায় বলি যে এই সোসাইটি স্বাস্থ্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু এটা ভাবা মোটেই সঙ্গত নয় যে আমাদের মতো কয়েক লক্ষ সোসাইটি বা ১০-২০ লক্ষ এনজিও গোটা দেশের ১৩০ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করে দেবে।

এদেশে টাকা যার সমাজ তার। সেই সমাজপতিরাই তথাকথিত সমাজসেবী, দেশনেতা ও চিন্তাবিদ; আর জনগণ না চাইলেও এঁদের হাতেই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। এঁদের কেউ মেয়ের বিয়েতে ৭ হাজার কোটি টাকা অপচয় (হ্যাঁ অবশ্যই অপচয়) করে, কেউ-বা অর্থাভাবে সামান্য টাকার ওযুধ কিনতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ! প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমরা অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি ফান্ডেড কোনো এনজিও নই, মহানুভবতা দেখানোর পরিবর্তে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই আমাদের এই উদ্যোগ। কিছু সমাজসচেতন, চিন্তাশীল ডাক্তার ও মানুষের সহযোগিতা আর উৎসাহে এই ক্লিনিক চলে।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ওযুধের বাজার ভারতবর্ষে বহুজাতিক ওযুধ কোম্পানিগুলির মাধ্যমে অর্থ, গাড়ি, বাড়ি, আসবাব, বিদেশভ্রমণ ইত্যাদির প্রলোভন উপেক্ষা করে ক-জন ডাক্তার সমাজসেবায় এগিয়ে আসতে পারেন? ফলে এদিকে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী আর অন্যদিকে রোগী ও তার আত্মীয়দের মধ্যে তৈরি হচ্ছে অবিশ্বাসের পরিবেশ। পরিণামে যত দোষ নন্দ ঘোষ এই আপ্তবাক্য মেনে ডাক্তারদের পেটানো আজ এক ভয়ংকর অসুখে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা বলি চিকিৎসাকে লোভনীয় ব্যাবসা বানিয়ে রাখলে কখনোই সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় আর তার পরিণতি এরকম হতে বাধ্য। আমরা স্বাস্থ্যের পণ্যায়নের তীব্র বিরোধিতা করি।

আমাদের দাবি:

কিন্তু হাল ছেড়ো না বন্ধু—এই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের পথচলা। দেশের সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের এই প্রতিশ্রুতি পালনের দাবিতে যতদিন না আমরা সবাই মিলে এগিয়ে আসতে পারব বা যতদিন না প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন হচ্ছে, ততদিন অভিজিৎ মিত্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটি বছরের ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা মানুষের সাথে থেকে সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে এগিয়ে চলবে, এটা আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। এই লক্ষ্যে আমাদের সংস্পর্শে আসা মানুষজনকে আমরা প্রতিনিয়ত বোঝানোর চেষ্টা করি যে নিজেকে সুস্থ রাখতে ও সুস্থসবল দেশ গড়তে সবার জন্য স্বাস্থ্য—এই দাবি ছাড়া অন্য কোনো গতি নাই।

অভিজিৎ মিত্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটি ৪৩/২, শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, বেতড় মোড়ের নিকট, হাওড়া ৭১১১০৪ ঠিকানায় একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ক্লিনিক পরিচালনা করে। ফোন- ২৬২৭০৯১৫/৯৮৩৬৭৯৫২০৭। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক অভিজিৎ মিত্র মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল সোসাইটি-র সম্পাদক

চিঠি

মাননীয় সম্পাদক,

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

মহাশয়,

আমি আপনাদের বৃত্তে অনেকদিন চক্কর খাচ্ছি—যখন পত্রিকা এত ঝকঝকে ছিল না সেই আমল থেকে। পত্রিকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লেখা আমাকে যত না আকৃষ্ট করত তার চেয়ে বেশি টানত “শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ”-এর চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মূলনীতি পত্রিকার পাতায় প্রকাশ হয়েছে সবসময়। আপনারা বলছেন যুক্তিসম্মত চিকিৎসা, ‘র‍্যাশনাল চিকিৎসা’, যেটা দিয়ে অনেক কম দামের ওষুধ প্রয়োগ করে মানুষকে সুস্থ রাখা যায়। পাশাপাশি বলার চেষ্টা, কোনো একক মানুষ কিছুই করতে পারবে না যতদিন না সরকার তার নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে—যার জনপ্রিয় স্লোগান “সকলের জন্য স্বাস্থ্য”।

কিন্তু আমাদের এই সেমি-আরবান শহরে আমি দেখতাম যে, কেউ এটা নিয়ে ভাবিত নয়। কেন নয় তা বুঝতে পারতাম না। তিনবছর হল আপনাদের অন্যতম সদস্য ডা. সুমিত দাশ-এর অনুপ্রেরণায়, বিশ্বজিৎ মিত্র-এর অনুপ্রেরণায় পথ চলা শুরু করি। ওঁরা ‘সকলের জন্য স্বাস্থ্য’ এই দাবিকে জনতার সঙ্গে থেকে প্রচার করেন। এমনকী অ্যাম্বুলেন্সে তাঁরা ওই স্লোগান লিখে রেখেছেন। কিন্তু উদাসীন মানুষ কখনো বুঝতে চান না।

আমাদের ডাক্তারবাবুরা সবাই আমাদের লোক কাছের লোক, বিনা পয়সায় সেবা করেন, কিন্তু তাঁরা সবসময় ‘র‍্যাশনাল চিকিৎসা’ করেন তা বলা যাবে না। তাঁরা ফিক্সড ডোজ় কম্বিনেশন ব্যবহার করেন, কাশির সিরাপ, দুর্বলতা কাটাতে নানা কিসিমের ভিটামিন প্রয়োগ করেন, দামি ওষুধ ব্যবহার করেন। এই কাজগুলিতে আমাদের কথা আর কাজের দূরত্ব ফুটে ওঠে। কিন্তু নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এইভাবে চলে এঁরা যতটা পারছেন করার চেষ্টা করছেন, মানুষকে রিলিফ দেবার। কিন্তু এই রিলিফ বা ত্রাণ যাঁরা পান তাঁরা তাতেই সন্তুষ্ট, তাঁদের দাবি স্বল্প, সস্তায় পাওয়া তো গেছে। আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা ডাক্তারের লেখা নামি কোম্পানির দামি ওষুধ ভেঙে অব্যাবসায়িক নামে দেন। সেখানে একটা ওষুধের বদলে দুটো-তিনটে ওষুধের কথা শুনলে অনেক রোগী তা নেন না, তাও ঠিক।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে আরও প্রচার দরকার। শুধু মিটিং-মিছিল নয় একেবারে গেরিলা পদ্ধতিতে তাদের মাথায় আক্রমণ চালিয়ে চেতনা-সম্পন্ন করে না তুলতে পারলে, “স্বাস্থ্য অধিকার, ভিক্ষা নয়” এই কথা স্পর্ধাভরে না বলতে পারলে, স্বাস্থ্য-আন্দোলন সংগঠিত করতে পারা যাবে না। তা না হলে অবস্থা দাঁড়াবে ‘ধর লক্ষণ—ধরে আছি’। এক বিখ্যাত ব্যক্তি বলেছিলেন “যে জাতির মুক্তির ইচ্ছা নেই সে জাতির মুক্তি সুদূর-পরাহত”। অনেক লম্বা পথ, যেতে হবে আমাদের দূর বহুদূর। ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে বাকিটা।

এতটা লেখার উদ্দেশ্য হল আপনাদের প্রেরণাকে জোরদার করার জন্য এই সব প্রতিষ্ঠান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি পত্রিকাতে প্রকাশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় লিখিনি, আর আমি বিদ্বজ্জন নই, এই চিন্তাগুলো দলা পাকাচ্ছিল তাই লিখছিলাম। হঠাৎ মনে হল শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের কাছে প্রকাশ করা যাক কথাগুলো—তাতে এই ব্যাপারে আমি কিছুটা হলে ঋদ্ধ হব, চলে যাবার আগে এইটুকুই সান্ত্বনা হিসেবে থাকবে, জীবনের বাকিটা সবই ফেলে দেবার।

নমস্কারান্তে

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ভুল সংশোধন

স্বাস্থ্যের বৃত্তে অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৮ সংখ্যায়, (পৃ.১১) ডা. কুশল সেন-এর লেখা “অ্যাকিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস” নিবন্ধে—“কীভাবে সন্দেহ করবেন প্যাংক্রিয়াটাইটিস হয়েছে” হেডিং-এর ৩ নম্বর পয়েন্টে “প্রচণ্ড জ্বর (১০০.৪° ফা.) . . .” লেখা আছে। এটা ১০৪° ফা. হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।